কিশোর উপন্যাস

ইসকুল বাড়ি

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

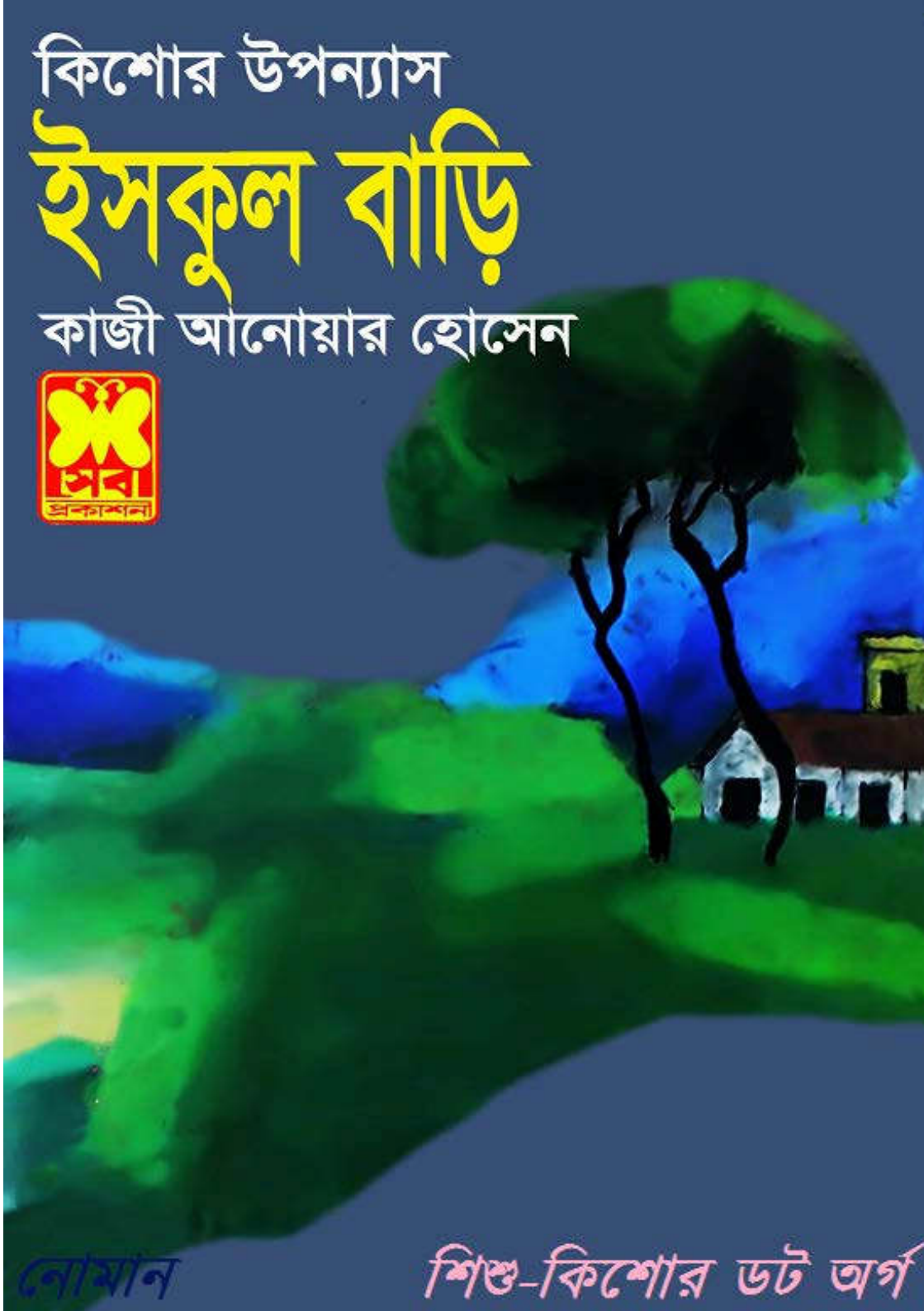

নোমান

শিশু-কিশোর ডট অর্গ

কাহিনি সংক্ষেপঃ

শহর থেকে দশ মাইল দূরে অদ্ভুত এক স্কুল খুলেছেন আদর্শ শিক্ষক ডক্টর আবদুর রহমান। অক্সফোর্ডের পিএইচডি তিনি, ফিরে এসেছেন দেশের টানে। পরিপূর্ণ মানুষ গড়ে তোলার ব্রত নিয়ে কাজ করছেন। খাতা-কলমেই শুধু নয়, হাতে-কলমেও শিক্ষা পায় ছেলেরা এখানে। গরীব-বড়লোকে কোন ভেদাভেদ নেই। স্নেহ-মমতা-ভালবাসা তার শিক্ষাদানের প্রধান হাতিয়ার।

ছোট্ট বেহালাবাদক তুহীন এলো এখানে লেখাপড়া শিখবে বলে। কদিন পরেই নিয়ে এলো ওর বেয়াড়া এক বন্ধু, দশ ঘাটের পানি খাওয়া খচ্চর সালামকে—যার মনটা ভাল, কিন্তু মুখটা খারাপ। ইসকুল বাড়িতে জমে উঠল এক বিচিত্র নাটক।

লুইযা মে অলকটের ‘লিটল মেন’-এর ছায়া নিয়ে

কিশোর উপন্যাস

ইসকুল বাড়ি

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

এই বইটি তৈরী করা হয়েছে

শিশু-কিশোর ডট অর্গ এবং ফেসবুক গ্রুপ

বাংলা বুক'স ডিরেক্ট লিংক এর সৌজন্যে

আরও ইপাব, মোবি এবং পিডিএফ এর জন্য

ভিজিট করুনঃ

http://shishukishor.org

এবং

bangla book's direct link

ISBN 984-16-1458-8

প্রকাশকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্বঃঅনুবাদকের

প্রথম প্রকাশঃ ২০০২

প্রচ্ছদ ও অলংকরণঃ ধ্রুব এষ

মুদ্রাকরঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

সেগুনবাগান প্রেস, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

দূরালাপনঃ৮৩১ ৪১৮৪

জি . পি. ও. বক্সঃ৮৫০

E-mail: Sebaprok@Citechco.net

একমাত্র পরিবেশকঃ প্রজাপতি প্রকাশন ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূমঃসেবা ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

প্রজাপতি প্রকাশন ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

এক

‘আচ্ছা, এইটাই কি ইসকুল বাড়ি?’ বিশাল গেট খুলে যেতেই ময়লা জামা পরা ছেলেটা জিজ্ঞেস করল ভয়ে ভয়ে। এইমাত্র বাস থেকে নেমেছে সে। বাসটা চলে যেতেই একেবারে সুমসাম হয়ে গেছে চারপাশ। ঘনিয়ে আসছে সন্ধ্যা। ভয়-ভয় লাগছে ওর।

একটু ঝুঁকে ওর দিকে তাকাল গেটে দাঁড়ানো ইয়াব্বড় কাঁচা-পাকা দাড়িওয়ালা বিকট চেহারার লম্বা-চওড়া লোকটা। ঠোঁটে সরল হাসি। বলল, ‘হ, খোকামণি। কও দেহি, কে ফাডাইছে তুমারে?’

‘চৌধুরী সাহেব। চিঠি আছে আমার কাছে।’

‘আইচ্ছা। কি নাম তুমার?’

‘তুহীন শেখ।’

‘ঠিগাসে, সুজা যাওগা সামনে। সদর দালানে গিয়া কড়া নারবা। কুনো চিন্তা নাই, ব্যবস্তা একটা অইবোই।’ বিশাল এক হাত রাখল সে ছেলেটার কাঁধে, আস্তে ঠেলে দিল সামনে।

লোকটার সুন্দর ব্যবহারে ভয় কিছুটা দূর হলো ছেলেটির। হালকা বৃষ্টি মাথায় নিয়ে এগিয়ে গেল সে মস্ত চারকোনা বাড়িটার দিকে রাস্তার দু’পাশে সবুজ ঘাসে ছাওয়া খেলার মাঠ। আঁধার ঘনিয়ে আসছে। ইসকুল বাড়ির কাঁচের জানালা দিয়ে ভিতরে উজ্জ্বল আলো দেখা যাচ্ছে, ভেসে

আসছে তরুণ কণ্ঠের কলগুঞ্জন। তুহীন ভাবছে, এই দুশ্চিন্তামুক্ত সুখী জীবন ওর মত ছিন্নমূল এক অনাথের কপালে জুটবে, এ-ও কি সম্ভব?

আস্তে করে কড়া নাড়ল ও দরজায়। মোটাসোটা এক পরিচারিকা খুলল দরজা। নীরবে খামটা এগিয়ে দিল তুহীন। খামের উপর লেখা নাম পড়ল মেয়েটা, দরজার পাশে একটা চেয়ারে বসার ইঙ্গিত করে বলল, 'এইখানে বইসা পাপোশের উপর খানিক পানি ঝরাও দেহি, আমি চিঠিটা নিয়া দেই খালাম্মার হাতে।'

দরজার পাশে বসে ভিতরের বিচিত্র দৃশ্যে মন দিল তুহীন। আট থেকে ষোল পর্যন্ত ছোট-বড়-মাঝারি নানান বয়সের ছেলে রয়েছে এ-ঘরে। খোলা দরজা দিয়ে দেখা গেল কয়েকটা কামরায় খেলায় মেতে আছে ছেলেরা। কয়েকটা বড়সড় ঘরে ডেস্ক, বেঞ্চ, ম্যাপ আর ব্ল্যাকবোর্ড দেখে বোঝা যাচ্ছে ওখানে ক্লাস বসে। হলরূমের একপাশে কার্পেটে শুয়ে-বসে ক্রিকেটের গল্প করছে বড় কয়েকটা ছেলে। লম্বা-চওড়া একজন ঘরের এককোণে বসে বাঁশী বাজাচ্ছে বিভোর হয়ে, কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। দু'তিনজন লাফিয়ে ডেস্ক টপকানোর প্রতিযোগিতায় মত্ত।

বামদিকের কামরায় দেখা যাচ্ছে লম্বা এক টেবিল, তার উপর রান্নাঘর থেকে এনে রাখা হচ্ছে গরমাগরম হাতরুটির পাহাড়, মুরগীর রেযালা, দুধের বাটি আর পানির জগ। বাতাসে ভেসে আসছে সুস্বাদু

খাবারের ঘ্রাণ-জিভে পানি এসে যায়, বিশেষ করে ক্ষুধার্ত বাচ্চা ছেলেদের।

হলঘরের আরেক দিকে, সিঁড়ির ধারে চলেছে কানামাছি খেলা। সিঁড়ির ওপর একপাশে চুপচাপ বসে মন দিয়ে বই পড়ছে সুদর্শন একটি ছেলে, তার পাশে একই রকম দেখতে একটা মেয়ে গান গেয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে তার পুতুলকে। কয়েকজন সিঁড়ির রেলিঙের উপর দিয়ে সাঁ-সাঁ করে বিপজ্জনক গতিতে পিছলে নেমে আসছে, লাফিয়ে নেমে আবার সিঁড়ি বেয়ে ছুটছে উপর দিকে।

এই খেলাটাই মন কেড়ে নিল তুহীনের। নিজেরই অজান্তে সামনে ঝুঁকে বসেছে। হঠাৎ নামার বেগ সামলাতে না পেরে রেলিং থেকে ছিটকে চিত হয়ে মেঝেতে পড়ল একটা প্রাণবন্ত ছেলে। মেঝেতে মাথা ঠোকার এমন জোর আওয়াজ হলো যে একছুটে ওর পাশে গিয়ে হাজির হলো তুহীন। সাধারণ কোন মাথা হলে মেঝেতে পড়েই দু'ভাগ হয়ে যেত, কিন্তু বিগত এগারোটা বছর যখন-তখন এখানে-ওখানে গুঁতো-গাঁট্টা খেয়ে মাথাটাকে কামানের গোলার মত শক্ত করে ফেলেছে এ-ছেলে। বার কয়েক চোখ পিট পিট করে অবাক হয়ে নতুন মুখের দিকে চেয়ে রইল সে কয়েক সেকেন্ড, তারপর ভুরু নাচিয়ে হাসিমুখে বলল, 'হ্যালো!'

'হ্যালো!' আর কি বলবে বুঝতে পারছে না তুহীন।

'তুমি বুঝি নতুন এলে?' শুয়ে শুয়েই জিজ্ঞেস করল ভূপাতিত বীর।

‘ঠিক জানি না এখনও।’

‘কি নাম তোমার?’

‘তুহীন শেখ।’

‘আমার নাম দিলদার বেগ, দিলু। চলো, খেলি। আসবে? হঠাৎ অতিথিপরায়ণ হয়ে উঠেছে, এক লাফে মেঝে ত্যাগ করল।’

‘মনে হয় উচিত হবে না,’ আমতা আমতা করে বলল তুহীন। ‘আগে জানতে হবে আমি থাকছি কিনা, তাই না?’

কথাটায় যুক্তি আছে, তাই সহজেই মেনে নিল দিলু, ঘাড় কাত করে সিঁড়িতে বসা পড়ুয়া ছেলেটিকে ডাকল সে, এই যে, কাঞ্চন-নতুন ছেলে এসেছে। একটু সঙ্গ দেবে ওকে? কথাটা বলেই আবার খেলায় মত্ত হয়ে গেল দিলদার বেগ দিলু।

সিড়িতে বসা ছেলেটা বই থেকে চোখ তুলে চাইল তুহীনের দিকে। বড় বড়, শান্ত, নিষ্পাপ দুই চোখ, মায়াময়-একটু যেন লাজুকও। বইটা বগলের নিচে চেপে নেমে এলো।

‘জুলিখালার সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার?’ জানতে চাইল কাঞ্চন।

‘ন-না, এখনও হয়নি। আমি অপেক্ষা করছি।’

‘তোমাকে কি আসাদ মামা পাঠিয়েছে?’ আবার জিজ্ঞেস করল কাঞ্চন।

‘চৌধুরী সাহেব পাঠিয়েছেন,’ জবাব দিল তুহীন।

‘উনিই তো আসাদ মামা! স্কুল বোর্ডের চেয়ারম্যান। মাঝে মাঝেই চমৎকার সব ছেলে পাঠান উনি।’

কথাটা শুনে হাসল তুহীন, ওর মলিন, শুকনো মুখটায় আশ্চর্য মিষ্টি একটা ভাব ফুটে উঠল। এরপর কথা ফুরিয়ে গেল দুজনেরই, বন্ধুত্বের ভাব নিয়ে শুধু চেয়ে রইল পরস্পরের দিকে। এমনি সময়ে পুতুলটা কোলে নিয়ে পাশে এসে দাড়াল ছোট্ট মেয়েটি। বলে না দিলেও বোঝা যায় ও কাঞ্চনের যমজ বোন। একই চেহারা, শুধু লম্বায় একটু কম, মুখটা একটু ভরাট, গালদুটো গোলাপী আর চোখের রঙ খয়েরী।

‘এ হচ্ছে আমার বোন, মণি,’ পরিচয় করিয়ে দেয়ার আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিতে বলল কাঞ্চন।

ওরা হাসল পরস্পরের দিকে চেয়ে। খুশিতে উদ্ভাসিত ছোট্ট মণির মুখ, বলল, ‘তুমি থাকলে আমাদের খুব ভাল লাগবে। এখানে আমরা কত মজা করি, তাই না, কাঞ্চন?’

‘করিই তো। জুলিখালা এইজন্যেই তো বানিয়েছেন এই ইসকুল বাড়ি।’

‘সত্যিই, চমৎকার জায়গা,’ নিজের মতামত জানাল তুহীন।

‘হ্যাঁ, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর জায়গা। না, কাঞ্চন?’ প্রশ্ন শুনেই বোঝা যায়, মণির বিশ্বাস সব বিষয়ে পণ্ডিত ওর ভাই।

‘না। ইসকুল বাড়ি আমার ভাল লাগে, কোনও সন্দেহ নেই তাতে; তবে আমার ধারণা, হিমবাহ আর সীলদের দেশ গ্রীনল্যান্ড এর চেয়ে আরও সুন্দর, আরও মজার।’

কথাটার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য ওর হাতের বইটা থেকে ছবি দেখাবার প্রস্তাব দিতে যাচ্ছিল কাঞ্চন, কিন্তু তার আগেই এসে গেল পরিচারিকা, মাথা ঝাঁকিয়ে বসার ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, ‘ঠিক আছে, খালাম্মা ডাকে তোমারে।’

‘বাহ, ভাল লাগছে!’ বলে উঠল মণি যেন কতদিনের চেনা, এমনি ভঙ্গিতে তুহীনের হাত ধরে টানল, ‘চলো, এবার জুলিখালার সঙ্গে দেখা করবে।’

কাঞ্চন ফিরে গেল তার বইয়ের প্রিয় জগতে, মণি পৌঁছে দিল তুহীনকে পিছনের একটা ঘরে। ওখানে সোফার উপর মোটাসোটা এক ভদ্রলোক দুটো বাচ্চা ছেলের সঙ্গে প্রবল বিক্রমে কুস্তি করছেন, কিন্তু কিছুতেই এঁটে উঠতে পারছেন না; আর একজন হালকা-পাতলা মহিলা চেয়ারে বসে তুহীনের আনা চিঠির ওপর চোখ বুলাচ্ছেন।

‘এই যে, এসেছে ও, দেখো, আন্টি!’ সরু, মিষ্টি গলায় বলল মণি। তারপর ফিরে গেল ভাইয়ের কাছে।

‘আচ্ছা! তুমিই তাহলে আমাদের নতুন ছেলে? তোমাকে পেয়ে আমার খুব ভাল লাগছে, তোমারও এ-জায়গাটা পছন্দ হবে, দেখো।’

ওকে কাছে টেনে এনে ওর কপালের ওপর থেকে একগাছি চুল সরিয়ে দিলেন জুলিখালা। মহিলার দু'চোখে মায়ের মমতা দেখতে পেয়ে তুহীনের ছোট্ট নিঃসঙ্গ হৃদয়টা কেমন যেন দুলে উঠল।

অপূর্ব সুন্দরী নন, কিন্তু হাসি-খুশি একটা ছেলেমানুষী ভাব রয়েছে মহিলার মধ্যে; চলনে বলনে এমন কিছু আছে যা মুহূর্তে আকর্ষণ করে মানুষকে। তুহীনের ঠোঁটের মৃদু কপিন তার চোখ এড়াল না। নোংরা, সস্তা জামা পরা ছেলেটিকে আরও কাছে টানলেন, মৃদু হেসে বললেন, 'আমি হলাম জুলিখালা, ওই ভদ্রলোক হচ্ছেন ডক্টর আবদুর রহমান বা রহমান খালু, আর ওদুটো বাচ্চা-রহমান, মানে, সুজন আর সুমন। কই, এসো ছেলেরা, পরিচয় করো, এই যে আমাদের নতুন ছাত্র তুহীন শেখ।'

বিশালদেহী কুস্তিগীর সোফা ছেড়ে উঠে দাড়ালেন, দুই কাঁধে দুই নাদুসনুদুস বাচ্চা। সুজন আর সুমন একগাল হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানাল নবাগতকে, কিন্তু মোটা ভদ্রলোক এগিয়ে এসে তুহীনের সঙ্গে হাত মেলালেন, তারপর ছোট্ট একটা চেয়ার দেখিয়ে অমায়িক কণ্ঠে বললেন, 'ওই চেয়ারটায় বসে পড়ো তো, বাপ। এই বোতামটা টিপলেই গরম বাতাস আসবে, ভেজা পা দুটো শুকিয়ে যাবে ঝটপট।'

'ভেজা? আরে, আই তো! খুলে ফেলো, জুতো জোড়া খুলে রেখে পা গরম করো। এক্ষুণি শুকনো কিছু জোগাড় করে আনছি আমি।' ব্যস্ত হয়ে পড়লেন জুলিখালা।

দুই মিনিটের মধ্যে শুকনো মোজা আর গরম স্লিপার পায়ে দিয়ে ব্লোয়ারের ধারে আরাম করে বসে কৃতজ্ঞতায় চোখে পানি এসে গেল তুহীনের। ধরা গলায় বলল, 'ধন্যবাদ!'

জুলিখালার দৃষ্টি আরও নরম হলো। বললেন, 'এইবার তোমার ওই বিচ্ছিরি কাশিটা দূর করতে হবে। কতদিন ধরে এরকম কাশছ বলো তো?'

'গোটা শীতকালটাই,' বলল তুহীন। 'শীতের শুরুতে ঠাণ্ডা লাগল, আর সারলই না।'

'তা তো হবেই, স্বামীকে বললেন জুলিখালা নিচু গলায়। স্যাঁতসেঁতে একটা আধ-খোলা বারান্দায় ঘুমায় বেচারা, একটা কাঁথাও নেই যে পিঠটা ঢাকবে।'

ছেলেটার বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, রোগা চেহারা, গলার ভাঙা স্বর আর কাশির দমকে বাঁকা হয়ে যাওয়া কাঁধ-কিছুই নজর এড়াল না রহমান খালুর। নীরবে মাথা ঝাঁকালেন তিনি। বড় ছেলেটাকে বললেন, 'সুজন, লক্ষ্মীছেলের মত একদৌড়ে ফাতেমার কাছ থেকে কাশির ওষুধের বোতল আর মলমের কৌটোটা চেয়ে আনো তো, বেটা।'

ওষুধের কথা শুনে শঙ্কিত হয়ে উঠতে যাচ্ছিল তুহীন, কিন্তু জুলিখালার কথায় হেসে ফেলল। 'ঐ শোনো!' ওর কানে কানে বললেন তিনি, 'দেখো আমার ছোট বদমাশটার কী সাঙ্ঘাতিক কাশি হয়ে গেল

হঠাৎ করে! তোমাকে যে ওষুধটা দেয়া হবে, তাতে মধু মেশানো আছে তো, তাই ওরও খানিকটা চাই!'

কাশতে কাশতে গালদুটো লাল করে ফেলেছে সুমন, তাই তুহীনকে ওষুধ খাইয়ে চামচটা দিতে হলো ওকে চাটবে বলে। খানিকটা মলম মাখিয়ে তুহীনের গলায় একটুকরো ফ্ল্যানেল পেচিয়ে দিলেন জুলিখালা।

একটু পরেই ঢং-ঢং করে বেজে উঠল খেতে যাওয়ার ঘণ্টা। লাজুক তুহীনের চেহারায় ভয় ফুটে উঠল, অপরিচিত ছেলেদের সামনে যেতে হবে এখন। জুলিখালা ওর একটা হাত ধরলেন, অপর হাতটা ধরল সুজন, গম্ভীর চালে বলল, 'তলো, কোন তিন্তা নেই। আমি দেখে লাখব তোমাকে।'

একটা লম্বা টেবিলের দুই ধারে চেয়ারের পিছনে দাড়িয়ে রয়েছে ছ'জন করে ছোট-বড় মোট বারোজন ছেলে। জুলিখালা বসলেন টেবিলের একমাথায়, বামপাশে সুমন আর ডানপাশে তুহীনকে নিয়ে। এবার সবাই বসতে তিনি বললেন, 'এ আমাদের নতুন ছেলে, তুহীন শেখ। খাওয়ার পর ওর সঙ্গে পরিচয় করে নিয়ো তোমরা। এবার তাহলে শুরু করা যাক।'

সবাই একবার তুহীনের দিকে চেয়ে নিয়ে চোখ বুঁজে মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানাল অন্নদাতাকে, তারপর মন দিল খাওয়ায়।

তুহীনের পাশেই বসেছে দিলু। খেতে খেতে একফাঁকে নিচু গলায়

ওকে জিজ্ঞেস করল তুহীন, ‘ওই মেয়েটার পাশে যে বসেছে, ওর নাম কাঞ্চন?’

‘হ্যাঁ, ও হচ্ছে কাঞ্চন হক, জুলিখালার বোনের ছেলে,’ জবাব দিল দিলদার বেগ দিলু।

‘খুব ভাল ছেলে, তাই না?’

‘ঠিক ধরেছ। অনেক জানে। সারাক্ষণই বই পড়ে তো!’

‘আর ওর পাশের মোটা ছেলেটা?’

‘ওকে আমরা ডাকি ভোটকু বলে। নামটা আসলে অনীক খান, কিন্তু অতিরিক্ত খায় বলে আমরা ওকে ডাকি অনেক খান বলে, ডাকনাম রেখেছি ভোটুকু। রহমান খালুর পাশে ওঁর ছেলে সুজন। তার পরের বড় ছেলেটা ওঁর ভাতিজা, আমাদের খলিল ভাই, আর কদিন পর এনজিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হবে। এখানে আমাদের দেখাশোনা করে, ছোটদের পড়ায়ও।’

‘ও তো বাঁশী বাজায়, তাই না?’ আবার প্রশ্ন করল তুহীন।

কিন্তু আস্ত একটা আলু মুখে পুরে জবান বন্ধ হয়ে গেছে দিলুর। মাথা ঝাঁকাল ও, তারপর অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে ওটাকে গলাধঃকরণ করে বলল, ‘ভাল বাজায়। আমরা এখানে বাজনার সঙ্গে গান করি, অনেক সময় ব্যায়ামও। আমার পছন্দ ড্রাম, শেখার চেষ্টা করছি।’

‘আমার সবচেয়ে ভাল লাগে বেহালা। বাজাতেও পারি,’ নিচু গলায়

বলল তুহীন।

‘তাই নাকি?’ তাজ্জব হয়ে চাইল দিলু ওর দিকে। ‘রহমান খালুর তো একটা পুরনো বেহালা আছে। তুমি চাইলে তোমাকে নিশ্চয়ই বাজাতে দেবেন।’

‘সত্যি? দারুণ হয় তাহলে! পথে পথে বেহালা বাজিয়ে বেড়াতাম আমি বাবার সঙ্গে, আরেকজন লোকও ছিল সাথে।’

‘খুব মজা হতো, তাই না?’ উত্তেজিত হয়ে উঠল দিলু।

‘নাহ্! খুব কষ্টের জীবন। শীতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, গরমে ভীষণ গরম। ক্লান্ত হয়ে যেতাম, ঠিকমত খাবার পেতাম না। আর ওরা রেগে গেলে মারত।’ পেঁচানো রুটিতে কামড় দিল তুহীন। তারপর বলল, ‘তবে আমার বেহালাটাকে বড্ডো ভালবাসতাম, এখনও দুঃখ হয়। আব্বা মারা যেতেই ওটা কেড়ে নিল কাদের মিয়া, আমার অসুখ হওয়ায় আমাকে নিল না, রেখে চলে গেল।’

‘যদি ভাল বাজাতে পার, তোমাকে ব্যান্ডে নিয়ে নেয়া হবে।’

‘তোমাদের এখানে ব্যান্ড আছে বুঝি?’ চোখ দুটো চকচক করে উঠল তুহীনের।

‘হ্যাঁ। ছেলেদের ব্যান্ড। গান-বাজনা হয় প্রায়ই। কাল শুক্রবার না? দেখো, কী মজা হয়!’

কথা শেষ হতে দুজনেই ব্যস্ত হয়ে ঝুঁকে পড়ল যার যার প্লেটের

উপর।

এর-ওর মগ ভরে দেয়ার ফাঁকে ওদের প্রতিটি কথা মন দিয়ে শুনলেন জুলিখালা। ওদিকে খেয়াল রাখতে হচ্ছে ছোট্ট সুমনের দিকেও। ঘুম এসে গেছে ওর, খেতে খেতে ঢুলছে, মুখে দিতে গিয়ে চোখে তুলছে রুটি, একটু পরেই নরম একটা বনরুটির ওপর গাল রেখে ঘুমিয়ে পড়ল বেখবর। দিলখোলা, দুষ্টু দিলুর পাশে লাজুক তুহীনকে বসিয়েছেন জুলিখালা ইচ্ছে করেই। ওদের আলাপের মধ্যে দিয়ে নতুন ছেলেটিকে বুঝতে চাইছেন তিনি।

আসাদ চৌধুরী চিঠিতে লিখেছেন:

প্রিয় সেজো আপা,

তোমার মনের মতন একটা ছেলে পাঠাচ্ছি। ছেলেটি গরীব, বর্তমানে এতিম ও অসুস্থ-কেউ নেই দেখবার। বাবার সঙ্গে পথে পথে বাজনা বাজিয়ে পেট চালাত এতদিন। ওকে পেলাম এক বাড়ির খোলা বারান্দায়, ফোঁপাচ্ছে ওর বাবা আর বেহালাটার দুঃখে। আমার মনে হয় কিছু আছে ছেলেটির মধ্যে। আমরা একটু সাহায্য করলে ও হয়তো মানুষ হতে পারে। তুমি যদি ওর শরীরটার দিকে খেয়াল দাও, আর দুলাভাই যদি ওর মনের ভার নেয়, তাহলে আমি সময় হলে দেখব ও সত্যিই কোনও প্রতিভা, না কি শুধুই গুণী। অন্তত ওর খেয়ে পরে বাঁচার একটা ব্যবস্থা আমরা নিশ্চয়ই করে দিতে পারব, কি বলো?

বারো বছর বয়সী রোগা, নোংরা জামা পরা ছেলেটাকে দেখে মায়া লেগে গেছে জুলিখালার। ব্যান্ডের কথা শুনে ওর চোখে-মুখে উৎসাহের ছাপ দেখেছেন তিনি। তা বাজাক না, সারাদিন যদি ও বেহালা বাজিয়ে সুখ পায়, ক্ষতি কি?

খাওয়া শেষ হতেই স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে তার বেহালাটা নিয়ে এলেন জুলিখালা। বললেন, 'আমাদের ব্যান্ডে একটা বেহালা থাকলে চমৎকার হয়।' তুহীনের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন তিনি যন্ত্রটা। 'কিছু একটা শোনাও দেখি, তুহীন।'

ভেবেছিলেন, ছেলেটি লজ্জা পাবে, দ্বিধা করবে বুঝি; কিন্তু অবাক হলেন ওকে আগ্রহের সাথে ওটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে আদর করে সুর বাঁধতে দেখে। বিন্দুমাত্র আড়ষ্টতা নেই ওর মধ্যে এ-মুহূর্তে। যেন মগ্ন হয়ে গেছে সুরের জগতে। আলতো করে ছড়টা বুলাল সে বেহালার তারে, ঘরের কথাবার্তা, গোলমাল গ্রাহ্য করছে না।

হঠাৎ একটা অতি পরিচিত জনপ্রিয় গানের সুর বেজে উঠতেই স্তব্ধ হয়ে গেল সব গোলমাল। কান খাড়া হয়ে গেছে সবার। নির্ভুল সুরে বাজছেঃ এমন একটা মা দে না, যে মায়ের সন্তানেরা কান্দে আবার হাসতে জানে।

চারদিক থেকে এগিয়ে এসে ঘিরে ধরল ওকে সবাই। এগিয়ে

এলেন রহমান খালুও। অবাক হয়ে দেখছেন সুরের মূর্ছনায় বিভোর হয়ে যাওয়া নবাগত ছেলেটিকে।

বাজনা থামতেই হৈ-হৈ করে অকুণ্ঠ প্রশংসা করল সবাই।

'ফাসক্লাস, ফাসক্লাস!' চেঁচিয়ে উঠল দিলু। ওর ধারণা ও-ই আবিষ্কার করেছে এই গুণী ছেলেটাকে।

একগাল হাসি নিয়ে খলিল বলল, 'ভাল একটা বেহালা পাওয়া গেল দেখছি আমাদের ব্যান্ডে!'

স্বামীর কানে কানে বললেন জুলিখালা, 'ঠিকই বলেছে আসাদ, কিছু একটা আছে ছেলেটার মধ্যে!'

মাথা ঝাঁকালেন রহমান খালু। একটা হাত রাখলেন তুহীনের কাঁধে। 'বাহ, সুন্দর হাত তো তোমার! এবার আরেকটা গানের সুর বাজাও দেখি, যেটা সবাই আমরা একসঙ্গে গাইতে পারি।'

পিয়ানোর সামনে বসলেন জুলিখালা, গিটার নিলেন রহমান খালু, তাঁর পাশে সবার দিকে মুখ করে দাড়াল তুহীন। চট্ করে বাঁশীটা নিয়ে এলো খলিল। চার যন্ত্রের কনসার্ট বেজে উঠতেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল সবার মুখ, জোর গলায় একসঙ্গে গেয়ে উঠল: আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী, আমি কি ভুলিতে পারি!

তুহীনের ছেঁড়া, ময়লা জামার দিকে নজরই গেল না কারও, সবাই চেয়ে আছে সুরে বিভোর ওর কচি মুখটার দিকে। আমি কি

ভুলিতে পারি! আমি কি ভুলিতে পারি!! ...ঘরের ছাদটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে শেষ হলো ওদের কোরাস। দেখা গেল, গালদুটো কাঁপছে তুহীনের; হঠাৎ বেহালাটা নামিয়ে রেখে দেয়ালের দিকে ফিরে ফোঁপাতে শুরু করল।

'কি হলো তোমার, তুহীন?' কাছে এসে জানতে চাইলেন জুলিখালা। হাত রাখলেন ওর পিঠে, 'কি হয়েছে?'

'আপনারা সবাই এতো ভাল,' বলল ও ভাঙা গলায়। 'কৃতজ্ঞ বোধ করছি-কান্না এসে যাচ্ছে-আর কেউ কোনদিন আমাকে—' বলতে বলতে কাশির দমকে দম বন্ধ হওয়ার জোগাড় হলো ওর।

'তুমি এসো আমার সঙ্গে,' বললেন জুলিখালা। 'বিশ্রাম দরকার তোমার। লম্বা একটা ঘুম দিলে কাল দেখবে অনেক ভাল লাগছে।'

নিজের ড্রইংরুমে নিয়ে গেলেন তিনি তুহীনকে। ওকে কান্নার সুযোগ দিয়ে টুকিটাকি কিছু কাজ সারলেন, তারপর ফিরে এলেন ওর কাছে। প্রশ্ন করে করে জেনে নিলেন ওর সমস্ত দুঃখের কথা, শুনতে শুনতে পানি এসে গেল তাঁর নিজের চোখেও।

শেষে বললেন, 'এবার তো বাবা-মা দুজনকেই পেলে, থাকার ঘর পেলে। কষ্টের কথা আর ভাবতেই যেয়ো না। ওসব অতীত, আর কখনও ফিরে আসবে না কষ্টের দিন। শোনো, এখন তোমার দরকার জলদি করে সেরে ওঠা। এখানে অনেক রকম ছেলে আছে, পরশুদিন দেখবে বাইরে থেকে ক্লাস করতে আসবে আরও দেড়শো ছেলে। আমরা চেষ্টা করছি

সবাইকে উপযুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে। তুমি সুস্থ হয়ে উঠলে যত খুশি ফুর্তি করবে, বেহালা বাজাবে, একটু-আধটু লেখাপড়াও করবে- কেমন? এবার চলো দেখি ফাতেমার ওখানে, গোসলটা সেরে নেবে; তারপর ঘুম। কাল আমরা ভেবে বের করব কি কি মজার কাজ দেয়া যায় তোমাকে। ঠিক আছে?'

কোনও জবাব দিতে পারল না তুহীন, ওর দু-চোখের কৃতজ্ঞ দৃষ্টিই বলল যা বলার। জুলিখালার হাত ধরে মস্ত একটা ঘরে গেল তুহীন। ওখানে হাসিখুশি, মোটাসোটা, গোল মুখের সেই মহিলা ওর দিকে চেয়ে মিষ্টি হাসল।

'এই হচ্ছে সবার প্রিয় ফাতেমা আপা। এ এখন তোমাকে গোসল করিয়ে চুল ছেঁটে দেবে। ওই যে সামনে বাথরুম, প্রত্যেক দিন ঘুমানোর আগে প্রথমে ছোট ছেলেদের, তারপর বড়দের গোসল করতে হয়।' কথা বলতে বলতে সুজনের জামা খুলে ফেললেন জুলিখালা। 'যাও, সুজন, দাঁড়িয়ে পড়ো।'

গোসলখানার একধারে একটা বড় চৌবাচ্চা, অপর দিকে পাশাপাশি কয়েকটা গরম পানির শাওয়ার। একটার নিচে গিয়ে দাড়াল সুজন, অপরটায় তুহীন। স্নানের পর গায়ে একটা কম্বল জড়িয়ে পিছন ফিরে বসতে হলো তুহীনকে, ওর চুল ছেঁটে দিচ্ছে ফাতেমা আপা। ছোটদের হয়ে যেতে ওদিকে বড় কয়েকটা ছেলে ঢুকেছে বাথরুমে। চেঁচামেচি করছে, আর চৌবাচ্চা থেকে তুলে ঝপাৎ ঝপাৎ করে গরম পানি ঢালছে

গায়ে, এ-ওর দিকে পানি ছিটাচ্ছে। আওয়াজে মনে হচ্ছে, একদঙ্গল তিমি মাছ বুঝি ঢুকে পড়েছে ওখানে।

'তুহীন এখানেই ঘুমাক,' বললেন জুলিখালা ফাতেমাকে। রাতে কাশি হলে ওষুধ আর গরম পানি দিতে পারবে তুমি।'

ঘাড় কাত করল ফাতেমা। চুল ছাটা হলে ফ্ল্যানেলের একটা পরিষ্কার নাইটগাউন পরিয়ে, ওষুধ খাইয়ে তুলে দিল ওকে ছোট একটা খাটে। ঝিরঝির করে স্বর্গের সুখ নামছে যেন তুহীনের প্রতিটি শিরা বেয়ে। সত্যিই কি তাহলে আশ্রয় পেল ও? একবার চোখ বুজেই খুলল আবার। না, গায়েব হয়ে যায়নি; স্বপ্ন বা কল্পনা তো নয়, সত্যিই ঘটছে এসব। এত আরামে ঘুম পালিয়েছে ওর।

অবশ্য একটু পরেই যা ঘটতে দেখল, ঘুমালেও জেগে উঠে বসতে হতো। স্নানঘর থেকে বেরিয়েই বালিশ-যুদ্ধে মেতে উঠেছে ছেলেরা। চারদিকে সাঁই-সাঁই ছুটছে বালিশ। বেশ কয়েকটা ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে তুমুল লড়াই। মাঝে মাঝে চাপের মুখে কেউ কেউ নার্সারিতেও ঢুকে আশ্রয় নিচ্ছে।

এতসব কাণ্ড ঘটছে, কিন্তু কেউ খেয়াল করছে না, কেউ বারণ করছে না কাউকে। শান্ত ভঙ্গিতে ছেলেদের আলনায় তোয়ালে ঝুলিয়ে রাখছে ফাতেমা আপা, জুলিখালা পরিষ্কার জামা-কাপড় গোছাচ্ছেন-যেন চারপাশে যা ঘটছে সব স্বাভাবিক। শুধু যে স্বাভাবিক তাই নয়, একজন নার্সারিতে

ঢুকে পড়ায় তেড়ে গেলেন জুলিখালা, ওঁর দিকে একটা বালিশ ছুড়ে ভোঁ দৌড় দিয়ে পালাতে চেষ্টা করেছিল ছেলেটা, কিন্তু খপ করে ওটা ধরেই ছুড়ে মারলেন তিনি ওর দিকে।

হাসি গিয়ে ঠেকল তুহীনের দুই কানে। বলল, 'ব্যথা লাগবে না ওদের?'

'ওই বাদরদের? আরে, দূর!' বললেন জুলিখালা। 'বিসুৎবার রাতেই কেবল এই বালিশ-যুদ্ধের অনুমতি আছে। রহমান খালু বলেন, আগামীকাল বালিশের খোলগুলো ধুতেই যখন হবে, খানিক খেলা হয়ে যাক না আগের রাতে...'

'মজার স্কুল তো এটা!' বলল তুহীন উৎসাহের সাথে। উঠে বসল বিছানায় ভাল করে দেখবে বলে।

আক্রমণভাগে রয়েছে দিলদার বেগ দিলুর দল, প্রতিরক্ষায় কাঞ্চনের গ্রুপ। কামানের গোলার মত ছুটে আসছে বালিশ, কেউ অসতর্ক থাকলে ধুপ করে গায়ে এসে পড়ছে; তবে বেশিরভাগ ধরে ফেলা হচ্ছে শূন্যে থাকতেই, সাজিয়ে রাখা হচ্ছে প্রতিপক্ষের গোলা-বারুদ শেষ হওয়ার অপেক্ষায়। তারপর তুমুল আক্রমণে যাবে কাঞ্চনের দল, বালিশ শেষ হয়ে গেলে আবার আত্মরক্ষা।

দশ মিনিট পর ঘড়ি দেখলেন জুলিখালা, 'তারপর চেঁচিয়ে বললেন, সময় শেষ। ছেলেরা সবাই উঠে পড়ো বিছানায়।'

মুহূর্তে থেমে গেল যুদ্ধ। যে-যার বালিশ কুড়িয়ে নিয়ে বিছানায় উঠল। নিভে গেল ঘরের আলো। চাপা কণ্ঠের দুয়েকটা কথা, খিলখিল হাসি- তারপর আস্তে আস্তে সব চুপ। গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়ে সুখ-স্বপ্ন দেখবে এখন ইসকুল বাড়ির ছেলেরা।

দুই

ওরা ঘুমাচ্ছে ঘুমাক, এই সুযোগে 'আদর্শ বিদ্যালয়', 'ইসকুল বাড়ি' আর এই ইসকুলের বোর্ডিঙে যারা থাকে তাদের সঙ্গে পরিচয়-পর্বটা সেরে নেয়া যাক।

বছর পাঁচেক হলো শহর থেকে দশ মাইল দূরের এই গ্রামে জঙ্গল, টিলা আর ফসলের মাঠসহ সাত একর জমি কিনে আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন ডক্টর আবদুর রহমান। দুটো শিফটে ক্লাস হয় এখানে। সকাল আটটা থেকে বারোটা পর্যন্ত ক্লাস করে বোর্ডিঙে যারা থাকে, অর্থাৎ আবাসিক ছেলেরা, আর একই সঙ্গে আশপাশের দু'চার গ্রামের গরীব মানুষের ছেলেমেয়ে যারা বেতন দিতে পারে না, তারা। আর দ্বিতীয় শিফটে একটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ক্লাস করে প্রায় দেড়শো ছেলেমেয়ে, তাদের মধ্যে কাছেপিঠের তো আছেই, দূর শহর থেকেও অনেকে আসে বাসে বা প্রাইভেট গাড়িতে করে।

বোর্ডিংসহ এই মস্ত বাড়িটাকে গ্রামের মানুষ বলে 'ইসকুল বাড়ি'। আমাদের কাহিনীর নামও যখন 'ইসকুল বাড়ি', তখন এখানে যারা বাস করে তাদের সঙ্গেই শুধু পরিচয় করব আমরা।

কোকড়া চুলের লম্বা ছেলেটার নাম খলিলুর রহমান। আঠারো বছরের হলে কি হবে গায়ে-গতরে রীতিমত বড়সড়। পড়ুয়া ছেলে, তবে সুরসিক, আর সঙ্গীতের মহা ভক্ত। এইচ.এস.সি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ড

থেকে বিজ্ঞান বিভাগে পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে। ওর চাচা, ডক্টর আবদুর রহমান, ওকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্যে বিশেষ ভাবে কোচ করছেন; আর চাচিআম্মা মা-মরা এই ছেলেটার ভেতর শিষ্টাচার ও ভব্যতা, নারী জাতির প্রতি সম্মান-বোধ, ছোটদের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা, সংসারের দরকারী কাজে সাহায্যের হাত বাড়ানো ইত্যাদি নানান সদগুণের বিকাশ ঘটাচ্ছেন। এখনই ও সব কাজে চাচির ডান হাত। ওঁর কাছ থেকে মায়ের আদর পেয়ে ধন্য।

তপন ছেলেটা আবার অন্যরকম। অস্থির, রগচটা আর সারাক্ষণই ব্যস্ত। সাগর-দস্যু ভাইকিংদের মত নাড়ীতে অনুভব করে ও সমুদ্রের প্রতি অদম্য টান। ওর কাকা পরিমল মিত্র বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের সমুদ্রগামী জাহাজের ক্যাপ্টেন। ওরও প্রতিমুহূর্তের স্বপ্ন নাবিক হবে। বন্ধুকে কথা দিয়েছেন রহমান খালু, ভাতিজাকে ন্যাভাল অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হওয়ার উপযুক্ত করে গড়ে দেবেন। এখন থেকেই নেভিগেশনের বই পড়তে শুরু করেছে ও, বিখ্যাত অ্যাডমিরাল আর সমুদ্রের মহানায়কদের জীবনী গড়গড় করে বলে যেতে পারে। পড়াশোনার পর ধরতে গেলে বাকি সময়টা ও খাল-বিল-ঝর্না-পুকুরে ব্যাঙের জীবন যাপন করে, ওর রহমান চাচা তাতে বাধা দেন না কখনও। নিজের ঘরটা ও সাজিয়েছে যুদ্ধ-জাহাজের কেবিনের মত করে। ক্যাপটেন কিড ওর আদর্শ, মাঝে-মাঝেই তার অনুকরণে গাঁ-গাঁ করে গেয়ে ওঠে জলদস্যুদের গান: ফিফটীন মেন অন দ্য ডেড ম্যানস চেস্ট, ইয়ো হো হো, অ্যান্ড আ

বটল অভ রাম! কথাবার্তায় স্টারবোর্ড, পোর্ট সাইড, ব্রিজ, অ্যাংকর, অ্যাহয় ইত্যাদি জাহাজী শব্দের ছড়াছড়ি, হাঁটে নাবিকদের মত দুলে দুলে। ইসকুল বাড়ির ছেলেরা ওকে ডাকে 'কমোডোর' বলে। কেউ বেড়াতে এলে গর্বের সঙ্গে দেখাতে নিয়ে যায় পুকুরে ভাসানো তপনের খেলনা জাহাজের বহর।

কাঞ্চন হচ্ছে জুলিখালার বোনের ছেলে। চুপচাপ, গম্ভীর, বুদ্ধিমান, সংযমী, শান্ত, সুন্দর, এবং বইয়ের পাগল-গোটা পরিবারের যত্ন ও ভালবাসার ফসল। তবে অভিজ্ঞতার অভাবে বাস্তববুদ্ধি কিছুটা কম, একটু বেশি কল্পনাপ্রবণ। অসমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে মিশলে এবং নিজ হাতে কাজ করা শিখলে ওর মধ্যে বাস্তবজ্ঞান আসবে, এই আশায় বাবা-মা ওকে ইসকুল বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। সে-ও এখানে ছোটবড় সবার সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে নিয়েছে অল্পদিনেই।

পাকা গৃহিণী হবে, বোঝা যায় ছোট্ট মণির প্রতিটি চালচলনে। ঘর-সংসারের সবরকম কাজে ওর আনন্দ। আদরে-শাসনে গোটা একটা পুতুল-পরিবার মানুষ করছে ও। এত ব্যস্ততার মধ্যেও সেলাই-ফোঁড়াই চলছে ওর সমান তালে। ওর হাতের কাজ এতই সূক্ষ্ম যে প্রায়ই পকেট থেকে রুমাল বের করে গর্বের সাথে দেখায় কাঞ্চন ওর বন্ধুদের। নিজের পিচ্চি বোন মিলিকেও একটা চমৎকার পেটিকোট বানিয়ে দিয়েছে মণি। খাওয়ার টেবিলে চামচগুলো সোজা করে রাখা, লবণদানীতে লবণ আছে কি না দেখা, বসার ঘরে রোজ ব্রাশ দিয়ে চেয়ার-টেবিল পরিষ্কার করা,

এরকম অসংখ্য কাজ নিজেই নিজের কাধে তুলে নিয়েছে ও।

জমজ ভাই-বোনে অসম্ভব ভাব, একজন আরেকজনকে ছাড়া একদণ্ডও টিকতে পারে না; তাই ওকেও পাঠাতে হয়েছে ইসকুল বাড়িতে। পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে ভাইকে সাধ্যমত সাহায্য করে মণি। 'আমার ভাই' বলতে অজ্ঞান, ওর ধারণা কাঞ্চনের কোনও তুলনা হয় না। রোজ সকালে নাস্তা খাওয়ার আধঘণ্টা আগে ঘুম ডেকে তুলে পরিষ্কার, ইস্তিরি করা জামাকাপড় ধরিয়ে দেয় ও ভাইয়ের হাতে। কাঞ্চনও মনে-প্রাণে ভালবাসে বোনকে, মুখ ফুটে বলেও। এ নিয়ে বন্ধুরা ঠাট্টা-তামাশা করলে অবাক হয়ে যায়, 'তোমরা তোমাদের বোনকে ভালবাসো না? যদি বাসো, সেটা স্বীকার করতে লজ্জা কিসের?'

ছোট্ট, প্রাণবন্ত সুজন সারাক্ষণ দৌড়ের ওপরেই আছে। মুখে কথার ফুলঝুরি। ভাগ্য ভাল দুষ্টু না, তেমন একটা সাহসীও না; তাই বড় কোনও অঘটন সহজে ঘটায় না। ঘড়ির পেন্ডুলামের মত সারাদিন ছুটছে একবার মা আর একবার বাবার কাছে।

সুমন এতই ছোট যে ইসকুল বাড়ির কর্মকাণ্ডে তার তেমন কোনও প্রভাব দেখা যায় না। তারপরেও কি করে যেন সবার অন্তরের একটা নরম জায়গা চলে গেছে ওর দখলে।

অমিত বসু আর রাশেদ আলমের বয়স আট। কথা বলতে গিয়ে রাশেদ তোতলায়। তবে দ্রুত সেরে যাচ্ছে দোষটা। ওকে বিদ্রুপ করা

নিষেধ। রহমান খালু ওর তোতলামি সারাবার জন্যে রোজ ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেন। এমনিতে ছেলেটা ভাল, তবে বিশেষত্বহীন। ইসকুল বাড়ির জীবনযাত্রার সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে নিয়েছে। মানিয়ে অমিত বসুও নিয়েছে। প্রথম দিকে পিঠের কুঁজটা নিয়ে খুব অস্বস্তি বোধ করত, কিন্তু এখন সহজ হয়ে গেছে; ওকে নিয়ে হাসাহাসি করায় যেদিন একটা ছেলেকে কঠোর শাস্তি দিলেন রহমান খালু, সেদিন থেকে সাবধান হয়ে গেছে সবাই; বুঝতে পেরেছে কারও দৈহিক ত্রুটি নিয়ে কটাক্ষ করা ভয়ানক নীচতা। লেখাপড়ায় খুব ভাল অমিত।

গাজী ফরিদ ফটকা ব্যবসায়ীর ছেলে, নিজেও খুব চালাকচতুর। ওকে এই স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে বিদেশী ডিগ্রীধারী ডক্টর আবদুর রহমান এর প্রতিষ্ঠাতা বলে নয়, অন্যান্য বোর্ডিংস্কুল থেকে এখানে খরচ কম বলে। অনেকে হয়তো ওর তীক্ষ্ণ বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হবে, কিন্তু রহমান খালু ওর টাকাপয়সার প্রতি অত্যধিক ভালবাসা আর সবকিছুর মধ্যে ধূর্ততার সাথে শুধু নিজের লাভটা খোঁজা ভাল চোখে দেখেন না।

সালাউদ্দীন আলী আর দশজন চৌদ্দ বছর বয়সীদের মতই হাড় সর্বস্ব, গোলমেলে ছেলে। সবকিছুই ভজকট হয়ে যায় ওর। ক্লাসঘরে ঢুকে তিন-চারটে বেঞ্চে গুঁতো না খেয়ে নিজের সিটে পৌঁছতে পারে না। নিজের সম্পর্কে বড়াই করে অনেক কিছু বলে, কিন্তু মুখে বলাই সার, কখনও কিছু করে দেখাতে পারে না। ছেলেটা একটু ভীতু টাইপের; সুযোগ পেলেই ছোট ছেলেদের ওপর চোখ গরম করে, গোপনে গায়েও

হাত তোলে, শাসায়; কিন্তু বড় ছেলেদের সামনে পড়লে একেবারে কেঁচো হয়ে যায়, চাটুকারিতা করে ওদের খুশি রাখার চেষ্টা করে। মানুষ হিসেবে খারাপ বলা যায় না, কিন্তু এরাই খুব তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যায় কুসংসর্গে পড়ে।

অনীক খান মায়ের অতি আদর-যত্নে ক্ষতিগ্রস্ত কিশোর। সেই ছোটবেলা থেকে সেধে-সেধে মা এতো বেশি-বেশি খাইয়েছে যে বারোতে পা দিয়েই এমন মোটা হয়েছে যে ঠিকমত নড়াচড়া করতে পারে না, কিছুটা ঘোলা হয়ে গেছে বুদ্ধিও। সাধারণ ছেলেদের চেয়ে তিনগুণ বেশি খায়, গায়ে-গতরেও তিনজনের সমান-তাই ছেলেরা টাইটেল দিয়েছে, ভোটুকু। এক প্রতিবেশীর কথায় ওর মা ওকে এই স্কুলে পাঠিয়েছেন। দেখা গেল, অল্পদিনেই লাইনে আসতে শুরু করেছে ছেলেটা, খাওয়া কমাতে না পারলেও, আর সবার দেখাদেখি নিয়মিত খেলাধুলা আর শরীরচর্চা করে দেহটাকে বাগে আনার চেষ্টা করছে।

মুন্না ছেলেটার আসল বয়স যদিও তেরো, মানসিক বয়স ছয় বছরের শিশুর চেয়ে বেশি নয়। তেমনি নিষ্পাপ ওর কথাবার্তা, চাল-চলন। পাঁতিহাস যেমন খাবার পেলে বাছ-বিচার ছাড়াই কোঁত-কোঁত করে গেলে, তেমনি খুব কম বয়সে ওকে দিয়ে সব বিদ্যা গেলাবার চেষ্টা করেছিলেন ওর বাবা। প্রতিদিন ছয়-সাত ঘণ্টা কঠিন সব পাঠ দিয়ে বসিয়ে রেখেছেন ছেলেকে। বাবা মনে করেছিলেন পিতার দ্বায়িত্ব পালন করছেন, কিন্তু ফলটা হল মারাত্মক; একবার জ্বরে পড়ল ছেলেটা, যখন সেরে উঠল,

দেখা গেল ভেজা কাপড় দিয়ে মোছা স্লেটের মত শূন্য হয়ে গেছে ওর মাথাটা।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাবা প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেলেন, ছেলের দিকে আর তাকাতে পারেন না। শেষে ইসকুল বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন ওকে, কিছু শিখতে না পারলেও অন্তত ব্যবহারটা তো ভাল পাবে এখানে। মুন্নাকে দেখলে করুণা হবে সবার; শান্তশিষ্ট ছেলেটা রোজই এ-বি-সি-ডি মুখস্থ করছে, কিন্তু পরদিন কিছু মনে রাখতে পারছে না। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে ওর স্মৃতিশক্তি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে যাচ্ছেন রহমান খালু। বইয়ের পড়ার চাইতে এখন খেলাধুলা আর কাজকর্মের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার দিকে জোর দিয়েছেন বেশি।

দৌড়ঝাঁপ ওর তেমন পছন্দ নয়, ওর ভাল লাগে চুপচাপ কোথাও বসে পাখিদের আচার-আচরণ লক্ষ করতে, কখনও বা কাজের-মানুষ বিকট চেহারার রুস্তম আলীর পিছুপিছু ঘুরতে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বিশালদেহী দৈত্য রুস্তম আলীকে ওর ভারি পছন্দ, ছাপার অক্ষর মনে রাখতে না পারলেও সরল মানুষের মধুর হাসি ও ঠিকই মনে রাখতে পারে।

লেখাপড়ায় ভাল হলে কি হবে, গোটা স্কুলে দুষ্টের চূড়ামণি হিসেবে পরিচিত একজনই-দিলদার বেগ, ওরফে দিলু বাঁদরের মত প্রতিমুহূর্তে কিছু না কিছু দুষ্টামি খেলছে ওর মাথায়। কিন্তু অন্তরটা ভাল বলে কেউ ওর বাদরামির কথা মনে রাখে না। প্রতিটা দুষ্কর্ম ধরা পড়ে যাওয়ার পর

সে এমন সব কঠিন প্রতিজ্ঞা করে, সেইসাথে নিজের জন্যে এমন সব অবাস্তব, ভয়ঙ্কর শাস্তির দাবি জানায় যে বড়দের পক্ষে গম্ভীর হয়ে থাকা প্রায়ই অসম্ভব হয়ে পড়ে।

একদিন হয়তো ও নিজের ঘাড়টাই ভেঙে বসবে, কিংবা বারুদ দিয়ে উড়িয়ে দেবে গোটা ইসকুল বাড়ি। ফাতেমাও তাই ব্যান্ডেজ, প্লাস্টার আর মলম নিয়ে সবসময় প্রস্তুত থাকে ওর জন্যে, কারণ, যে-কোনও মুহূর্তে বয়ে আনা হতে পারে অর্ধমৃত দিলুকে। কিন্তু প্রতিটা দুর্ঘটনার পর সেরে উঠেই দ্বিগুণ উৎসাহে খোঁজে সে আরেকটা দুষ্টামির সুযোগ।

প্রথম দিন এখানে এসেই নিজের একটা আঙুলের মাথা কেটেছে খড় কাটার যন্ত্র দিয়ে; এবং প্রথম সপ্তাহেই একচালা শেডের ওপর থেকে নিচে পড়েছে; মুরগীর বাচ্চাকে আদর করতে গিয়ে ক্রুদ্ধ মুরগীর ঠোকর আর তাড়া খেয়ে জান-প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে উর্ধ্বশ্বাসে; রান্নাঘরে চুরি করে দুধের সর খেতে গিয়ে কিল খেয়েছে আসিয়ার; স্কুল থেকে পালাতে গিয়ে রাস্তায় ধরা পড়েছে। কিন্তু এতসব বাধা-বিঘ্ন বা ধমক-শাসন ওকে বিন্দুমাত্র দমাতে পারেনি, যখন-তখন নিত্য-নতুন দুষ্টবুদ্ধি চমক দিচ্ছে ওর উর্বর মস্তিষ্কে, আর দ্বিধামাত্র না করে নেমে পড়ছে ও সেই দুষ্কর্মে- কখন যে কী করে বসে, সেই ভয়ে সারাক্ষণ তটস্থ হয়ে থাকে ইসকুলের সবাই।

এক শনিবারের ব্যস্ত সকালে বদরাগী আসিয়াকে কাপড় শুকাবার দড়ি পেঁচিয়ে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল ও ঝাড়া একটা ঘণ্টা; ভ্রূকুটি,

বকাঝকা, ফোঁসফাঁস, অনুনয়-বিনয়, কিছুতেই কোনও কাজ হয়নি। একবার খাওয়ার টেবিলে বসে কাজের ছুড়ির জামার ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছিল গরম একটা কয়েন; ডালের বাটি উল্টে ফেলে এমন লাফঝাপ দিয়েছিল মেয়েটা যে সবাই ভেবেছিল মাথা খারাপ হয়ে গেছে ওর। আরেকদিন হাতলের সঙ্গে সুন্দর একটা রিবন বেঁধে এক বালতি পানি রেখে দিয়েছিল ও গাছের ওপর। ঝিলমিলে ফিতের আকর্ষণে মণি গিয়ে যেই টান দিয়েছে ওটায় ওমনি পুরো বালতির পানি চুপচুপে করে ভিজিয়ে দিয়েছে ওর পরিষ্কার জামা-কাপড়। ভ্যাঁ করে কেঁদেই দিয়েছিল বেচারী। ওর আপন দাদী যেদিন চায়ের দাওয়াতে এলেন, সেদিন চিনির পাত্রে সাদা পাথরের দানা রেখে দিয়েছিল বদমাশটা, অবাক হয়ে বৃদ্ধ খেয়াল করলেন, বারবার চামচ নেড়েও কাপের চিনি কিছুতেই গলানো যাচ্ছে না; কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে টুঁ-শব্দটি না করে বিস্বাদ চা শেষ করে উঠে গেলেন। আর একবার এক মিলাদ মাহফিলে হাতের তালুতে একগাদা নস্যির গুঁড়ো নিয়ে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিল বন্ধুদের নাকে-মুখে; পাঁচ-পাঁচটা ছেলে এমনই হাঁচি মারতে শুরু করল যে ওদের বাইরে বের করে না দিয়ে আর উপায় থাকল না। আসিয়ার স্বামী রুস্তম আলীর লজ্জা-ওর পা অতিরিক্ত বড়; প্রায়ই জ্বালাতন করে সে নির্বিবাদী মানুষটাকে ওর বিশাল সাইজের বুট মানুষের চোখে পড়ে এমন জায়গায় ঝুলিয়ে রেখে। এইতো কদিন আগে গোটা ইসকুল বাড়িকে হাসিয়ে মেরেছিল ও সক্কালবেলা মুরগীগুলোকে তাড়িতে ভেজানো রুটি খেতে

দিয়ে। মদ খেয়ে ওগুলো এমনই বেহেড মাতলামি শুরু করল যে রহমান খালু পর্যন্ত না হেসে পারেননি। শেষে স্নেহময়ী মণি ওগুলোকে খাঁচায় পুরে ওদের মান বাচাল, ওখানে লম্বা একটা ঘুম দিয়ে উঠে তবে গে কাটল নেশা।

এই নানান রকম ছেলেদের নিয়েই শহর থেকে দশ মাইল দূরের এই ইসকুল বাড়ির বোর্ডিংস্কুল। এখানে ইতিহাস, ভূগোল, ইংরেজি, বাংলা, অঙ্ক যেমন শেখানো হয়, তেমনি মাঠে-ময়দানে প্রকৃতির কাছ থেকে বাস্তব জ্ঞান আহরণের জন্যে উৎসাহ দেয়া হয়। সবরকম শিক্ষার ব্যবস্থা রেখেছেন এখানে ডক্টর রহমান; তারই পাশাপাশি চলছে ওদের ব্যায়াম ও খেলাধুলার মাধ্যমে মনোদৈহিক উন্নতির প্রচেষ্টা...সততা, নিষ্ঠা, ন্যায়নীতি, আত্মজ্ঞান, আত্মসংযম, দায়িত্ববোধ ও আত্মপ্রত্যয়ের শিক্ষা।

এবার জুলিখালা আর রহমান খালু সম্পর্কে দু-একটা কথা। ডক্টর আবদুর রহমান পি.এইচ.ডি করেছেন ইংল্যান্ডে, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে। বিদেশে ভাল বেতনে ভাল চাকরির ডাক উপেক্ষা করে দেশের টানে বছর ছয়েক আগে চলে এসেছেন এই গ্রামে, মনের মত একটা স্কুল গড়ে ছেলেমেয়েদের হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়ে সত্যিকার মানুষ করে তোলার ব্রত নিয়ে।

জুলিখালা এসেছেন স্বামীর সঙ্গে। তিনি নিজেও বি.এ., বি.এড.-আদর্শ বিদ্যালয়ের একজন স্বনামধন্য শিক্ষয়িত্রী।

সবার শেষে ইসকুল বাড়ির বাইরের একজনের কথা না বললেই নয়। ইনি হলেন আসাদ চৌধুরী, এই স্কুলের সম্মানিত চেয়ারম্যান। জুলিখালার আপন খালাত ভাই। থাকেন দশ মাইল দূরের শহরটায়। ব্যবসা করে অনেক টাকা করেছেন, কিন্তু মনেপ্রাণে শিল্পী-অবসর পেলেই গান রচনা করে তাতে মিষ্টি সুর দেন এখনও। ভগ্নিপতির আদর্শে মনেপ্রাণে অনুপ্রাণিত। তিনিই তৈরি করে দিয়েছেন ইসকুল বাড়ির পাশে পুব-পশ্চিমে লম্বা দশ কামরার স্কুলঘরটা। হাসিখুশি, সহৃদয় মানুষ বলে আসাদ চৌধুরী এই অঞ্চলে সবার প্রিয়পাত্র।

তিন

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই তুহীন দেখল পাশের চেয়ারে ওর জন্যে রাখা আছে পরিষ্কার জামা-কাপড়। নতুন নয়, ধনী কোনও ছাত্রের বাতিল করা ব্যবহৃত কাপড়, কিন্তু তুহীনের জন্য এ-জামা ভালর চেয়েও ভাল। কাপড় পরা শেষ হতেই ধবধবে সাদা পোশাক পরে ওকে নাস্তার জন্যে ডাকতে এলো দিলু।

কাঁচের জানালা দিয়ে ঝলমলে রোদ এসে পড়েছে ডাইনিং রূমে। টেবিলে সাজানো রয়েছে খাবার, সুবাস ছড়াচ্ছে। ক্ষুধার্ত সবাই, কিন্তু সুশৃঙ্খল ভাবে দাড়িয়ে আছে যে-যার চেয়ারের পিছনে। খালা-খালু বসার পর সবাই বসে পড়ল নাস্তা খেতে। রোজকার বরাদ্দ দুধ-রুটির বদলে সেদ্ধ ডিম, ভাজা মাংস, মাখন দেয়া পাউরুটি টোস্ট আর কফির আয়োজন আজ। কথা হলো কম, সবাই ঝটপট নাস্তা খেয়ে নিল, কারণ আগামী সপ্তাহে কার কি কাজ লিখে নিতে হবে আজই, তাছাড়া ছুটির দিনে দল বেঁধে হাঁটতে যাওয়ার প্রোগ্রাম তো আছেই।

খেতে খেতে সবার সব কিছু মন দিয়ে লক্ষ করছে তুহীন। পরিবেশটা বড় ভাল লাগছে ওর। সবাই প্রাণোচ্ছল, কিন্তু হৈ-হল্লা নেই; শান্ত, সমাহিত একটা ভাব বিরাজ করছে সবকিছুতে।

‘এবার সবাই তোমাদের সকালের কাজগুলো সেরে নাওগে,’ খাওয়া শেষ করে বললেন রহমান খালু। ‘যারা শহরে যাবে তারা খেয়াল রেখো,

তিন মিনিটের বেশি দাঁড়াবে না বাস। এসে যেন তোমাদের তৈরি পায়।'

সবাই যে-যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। প্রত্যেককেই কিছু না কিছু কাজের দায়িত্ব দেয়া আছে: কেউ কাঠ বা পানি আনে, কেউ সিঁড়ি ঝাড়ু দেয়, কারও কাজ জুলিখালাকে টুকিটাকি কাজে সাহায্য করা। কেউ পোষা, জন্তুদের খাওয়ায়, কেউ বা পশুগুলোর পরিচর্যায় খলিল ভাইকে সাহায্য করতে যায় গোলাঘরে। পেয়ালাবাসন ধোয়ার দায়িত্ব মণির ওপর, সেগুলো মুছে জায়গামত তুলে রাখবে কাঞ্চন। এমন কি পিচ্চি সুজনের জন্যেও কাজ বরাদ্দ আছে, দৌড়ঝাঁপ করে ন্যাপকিনগুলো গুছিয়ে রাখে, চেয়ারগুলো সোজা করে সাজিয়ে রাখে। ঘণ্টাখানেক মৌমাছির মত ব্যস্ত থাকে ওরা, তারপর জামা কাপড় পরে তৈরি হয়ে যায় বড় ছেলেরা, বাস এসে গেলে রহমান খালুর সঙ্গে ওতে উঠে বসে ওরা আটজন। দশ মাইল দূরের শহরে গিয়ে কেউ আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করে, কেউ টুকিটাকি কাজ সারে, সাবান-টুথপেস্ট-খাম কেনে বা চিঠি পোস্ট করে; রহমান খালু আগামী সপ্তাহের জন্যে বাজারসদাই করে তপনের জিম্মায় রেখে আর সবাইকে নিয়ে মসজিদে ঢোকেন, জুম্মার নামাজ সেরে সবাই বাসে চেপে ফিরে আসে ইসকুল বাড়িতে।

কাশির কারণে ছোটদের সঙ্গে স্কুলেই থেকে গেল তুহীন। জুলিখালা ওদের মজার-মজার গল্প পড়ে শোনালেন, কয়েকটা ছড়া শেখালেন, কি করে খাতায় ছবি সাঁটতে হয় শেখালেন।

একটা বিশেষ খাতা বের করে দেখালেন তুহীনকে, প্রত্যেকটি ছেলের

নামে একটা করে পাতা বরাদ্দ আছে ওতে। খাতাটার নাম দিয়েছেন তিনি ‘বিবেক’। গোটা সপ্তাহে কে কি ভাল বা মন্দ কাজ করল সব লেখা হয় ওতে, পাতা উল্টে দেখালেন তুহীনের নামও তোলা হয়েছে একটা পৃষ্ঠায়। ‘কেবল তুমি আর আমি জানব কি লেখা হবে এখানে। আলাপ করে স্থির করব গুণগুলো কি করে আরও বাড়িয়ে তোলা যায়, আর দোষ কি করে শুধরে নেয়া যায়। আমি চাই আমার প্রতিটি ছেলের কৃতিত্বে গর্ব অনুভব করতে, তাই না, সুমন?’ বলেই কালিভরা দোয়াতটা পকেটে পোরার ঠিক আগমুহূর্তে ওকে টেনে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তুহীনকে বললেন, ‘ইচ্ছে করলে তুমি এখন বেহালা প্র্যাকটিস করতে পার। এক কাজ করো না কেন, আজ রাতে আমরা যে গানগুলো গাইব তার লিস্টি তৈরি আছে, তোমার জানা গানগুলো তুমি আগে থেকে বেহালায় প্র্যাকটিস করে রাখতে পার স্কুলরমে গিয়ে।’

‘স্বরলিপি নেই?’ আগ্রহের সাথে জিজ্ঞেস করল তুহীন। ‘আছে, নজরুলগীতি-রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রায় সব গানেরই স্বরলিপি আছে আমাদের কাছে। ওই যে, ওই তাকে সাজানো। আর এই হচ্ছে আজকের গানের লিস্ট।’

বেহালায় সুর বেঁধে ছড়াটায় রজন ঘষে নিল তুহীন। তারপর স্কুলঘরের খোলা জানালার ধারে বসে সামনে স্বরলিপির বই নিয়ে দেড়-দু’ঘণ্টা এক মনে চর্চা করল ও। ‘আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর’ গানটির গুরুগম্ভীর সৌন্দর্য মুগ্ধ, আবিষ্ট করে ফেলল ওকে।

আর ‘ধন-ধান্য, পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা’ ওকে আপ্লুত করল দেশপ্রেমে; গানটির ‘এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, (ও সে) সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি...’ এ-পর্যন্ত এসে ঝাপসা হয়ে গেল সব, ভিজে গেছে ওর চোখ। মনে হলো অতীতের সব দুঃখ-কষ্ট ধুয়ে মুছে দূর হয়ে গেল, সত্যি-সত্যিই আনন্দলোকে চলে এসেছে ও।

শহর থেকে ফিরে এলো ওরা, দুপুরের খাওয়া সেরে সবাই যে-যার ব্যক্তিগত কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কেউ গল্পের বই পড়ছে, কেউ বাড়িতে চিঠি লিখছে, কেউ বা শনিবারের পড়া তৈরি করছে। যারা গল্প করছে তারাও আজ কথা বলছে নিচু গলায়। ছুটির দিনে পবিত্র শান্তি বিরাজ করছে গোটা ইসকুল বাড়িতে।

তিনটে বাজতেই সবাই বেরলো মাঠে-জঙ্গলে, টিলা-টক্করে একসাথে হাঁটবে বলে। এটা শুধু ব্যায়াম নয়, রহমান খালুর কাছ থেকে প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য, বৈশিষ্ট্য আর গূঢ় তাৎপর্য জেনে নেয়ার দুর্লভ সুযোগ। সব কিছুতেই তিনি মঙ্গল দেখতে পান, এটাও মস্ত শিক্ষা।

জুলিখালা নিজের দুই বাচ্চা আর মণিকে নিয়ে এক্কা গাড়িতে চাপলেন। সপ্তাহে এই একটা দিনই শহরে গিয়ে মাকে দেখে আসার সুযোগ পান তিনি। তুহীনের জন্যে দীর্ঘ পথ হাঁটা কষ্টকর হবে বলে তাকে স্কুলেই থাকতে বলা হলো। দরাজদিল দিলুও থেকে গেল তুহীনকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ইসকুল বাড়ির কোথায় কি আছে দেখাবে বলে।

‘বাড়ির ভেতরটা তো দেখেইছো,’ বলল ও। ‘চলো, তোমাকে বাগান, গোয়ালঘর, গোলাঘর আর আমাদের পোষা পশু-পাখির খাঁচা দেখিয়ে আনি!’ বলেই হাঁটা ধরল ও।

‘পশুপাখির খাঁচা মানে?’ দিলুর পাশাপাশি চলতে শুরু করেছে তুহীন।

‘আমাদের সবারই কিছু না কিছু পোষা জানোয়ার বা পাখি আছে। গোলাঘরের একপাশে বেশ খানিকটা খালি জায়গা নিয়ে আমাদের চিড়িয়াখানা। ওই দেখো, তাকিয়ে দেখো, দারুণ না আমার গিনিপিগটা?’ এই বলে গর্বের সঙ্গে আঙুল তুলে যেটাকে দেখাল, তুহীনের মনে হলো এরচেয়ে কুৎসিত গিনিপিগ আর হয় না!

কিন্তু সেকথা না বলে উত্তরটা একটু ঘুরিয়ে দিল ও। ‘আমার চেনা এক ছেলের কাছে বারো-চোদ্দটা আছে। আমাকে একটা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আমার তো পোষার উপায় ছিল না। ধবধবে সাদা ছিল ওটা, গায়ে ফুটিফুটি কালো দাগ...খুব সুন্দর। তুমি চাইলে তোমার জন্যে ওটা আমি চেয়ে আনতে পারি।’ দিলুর বদান্যতার কিছু একটা প্রতিদান দেয়ার জন্যে উদগ্রীব তুহীন।

‘তাহলে তো চমৎকার হয়। আমি আমারটা দিয়ে দেব তোমাকে। মারপিট না করলে ওরা একসঙ্গেই থাকতে পারবে। ওই যে, ওই সাদা ইঁদুরগুলো সুজনের-খলিল ভাই দিয়েছে ওকে। খরগোশগুলো সালাউদ্দীনের, আর বাইরের ওই তিতিরগুলো ভোটকুর। আর ওই যে

বাক্স দেখছ, ওটা হচ্ছে কাঞ্চনের কাছিমের ট্যাঙ্ক-অবশ্য এ-বছর একটাও জোগাড় করতে পারেনি এখনও। গতবছর ছিল বাষট্টিটা। কোন-কোনটার শক্ত খোলস ছিল। একটার পিঠে নিজের নাম আর সাল খোদাই করে ছেড়ে দিয়েছে ও খালে, যদি কোনদিন আবার ধরা পড়ে তাহলে যাতে দেখেই চিনতে পারে। কোথায় নাকি পড়েছে, কয়েকশো বছর আগের তারিখ লেখা একটা কাছিম পাওয়া গেছে!'

'আর এই বাক্সে কি?' অর্ধেক মাটি ভরা একটা উঁচু বাক্স দেখাল তুহীন আঙুল তুলে।

'ও, ওটা হচ্ছে গাজী ফরিদের পোকার দোকান। মাটি খুঁড়ে এতো-এতো কেঁচো তুলে এই বাক্সে ছেড়ে দেয় ও। আমরা কেউ মাছ ধরতে গেলে ওর কাছ থেকে কিনে নিই। এতে অনেক ঝামেলা বেঁচে যায় ঠিকই, কিন্তু ওর দাম খুব চড়া। ব্যাটা একটা চামার-গতবার আমার কাছ থেকে নিয়েছিল প্রতি ডজনে ছয় টাকা, তাও আবার দিয়েছিল ছোট ছোট। আমি বলে দিয়েছি, দাম না কমালে আগামীতে আমি নিজেই তুলে নেব মাটি খুঁড়ে। আমারও তো দুই-দুইটা মুরগী আছে, জুলিখালার কাছে ডিমগুলো বিক্রিও করি: কই, আমি তো যা-খুশি দাম হাঁকি না; বাজারে কিনতে গেলে বারোটা ডিম নেবে ছত্রিশ টাকা, আমি নিই মাত্র বিশ টাকা। মানুষের চক্ষুলজ্জা বলে তো কিছু থাকতে হয়!' ভ্র কুঁচকে পোকার বাক্সের দিকে তাকাল দিলু।

'কুকুরগুলো কার?' জানতে চাইল তুহীন।

‘ওই যে বড়টা, ওটা তপনের। নাম রেখেছে ক্রিস্টোফার কলম্বাস। ছোট সাদা বাচ্চাটা সুজনের, আর হলুদটার মালিক সুমন। এক লোক ও দুটোকে আমাদের পুকুরে চুবিয়ে মারতে এনেছিল, কিন্তু রহমান খালু তাকে বকেঝকে দুই ছেলের জন্যে রেখে দিয়েছেন ওগুলো। একটার নাম বাঘা, আরেকটার নাম এখনও ঠিক হয়নি।’

‘সম্ভব হলে ওই ওটার মত একটা খচ্চর পালতাম আমি,’ বলল তুহীন। ‘ওর পিঠে চড়ে মজা করে ঘোরা যেত।’

‘ওটা খচ্চর না-আসলে গাধা। ওর নাম একনম্বর। আসাদ সাহেব পাঠিয়েছেন ওটা জুলিখালার জন্যে, যাতে হাঁটতে বেরিয়ে সুমনকে পিঠে নিতে না হয়। আর ওই যে কবুতরের ঝাঁক, ওগুলো আমাদের সবার। ইচ্ছে করলে ওপরে উঠে কাছ থেকে দেখতে পার, আমি ততক্ষণে খুঁজে দেখি আমার মুরগিগুলো ডিম পাড়ল কি না।’

মই বেয়ে ওপরে উঠে গেল তুহীন। এক ঝাঁক পায়রা ওখানে বাকবাকুমকুম করছে। দালানের কার্নিসে বসে আছে কয়েকটা। ছোট একটা দল উড়ছে রোদেলা আকাশে। উঁচু থেকে দূরের মাঠে দেখা গেল গোটা কয়েক দুধেল গাই চরছে।

আমি ছাড়া সবারই কিছু না কিছু আছে, ভাবছে তুহীন। ইশ্, আমার নিজের যদি পায়রা, মুরগী বা নিদেন পক্ষে একটা কচ্ছপ থাকত! মই বেয়ে নেমে গোলাঘরে চলে এলো ও । দিলুকে জিজ্ঞেস করল, ’তোমরা

এসব পাও কি করে?'

'খুঁজে পাই, অথবা কিনি, আবার কেউ হয়তো দান করে। মুরগী দুটো দিয়েছে আমার বাবা। ডিম বেচে টাকা জমলেই ভাবছি একজোড়া হাঁস কিনে ফেলব। পালতে কোন অসুবিধে হবে না, গোলাঘরের পেছনেই সুন্দর পুকুর আছে একটা। হাঁসের ডিমের দামও পাওয়া যায় বেশি, তাছাড়া ওদের ছানাগুলো দেখতে ভারি মজার হয়-বিশেষ করে সাতার কাটে যখন।' হাঁসের গুণগান শেষ করে কোটিপতির হাসি হাসল দিলু।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল তুহীন। ওর বাবাও নেই, টাকাও নেই। ওর একমাত্র সম্পত্তি বলতে কয়েকটা গান লেখা একখানা পুরনো পকেটবুক।

তুহীনের দীর্ঘশ্বাসটা লক্ষ করল দিলু, চোখ কাত করে এক মুহূর্ত চিন্তা করেই বের করে ফেলল সমাধান। 'শোনো, তুমি এক কাজ করতে পার। ডিম খুঁজতে আমার একটুও ভাল লাগে না। তুমি যদি আমার ডিম খুঁজে দেয়ার দায়িত্ব নাও তাহলে প্রতি বারোটার জন্যে আমি একটা করে ডিম দেব তোমাকে, এই রকম বারোটা ডিম জমাতে পারলেই জুলিখালার কাছে বিশ টাকায় বেচে সেই পয়সায় তোমার যা খুশি কিনে নিতে পারবে। করবে?'

'করব!' হাসি ফুটল তুহীনের মুখে। 'তুমি খুব ভাল, দিলু।'

'আরে, নাহ!' লজ্জা পেল দিলু, 'ও কিছু না। তুমি তাহলে আজই শুরু করে দাও, কি বলো। ওই দেখো, কাজলী কি রকম কঁক্ কঁক্ করছে।

অন্তত একটা ডিম তুমি পাবেই। আমি তাহলে এখানেই অপেক্ষা করছি।' বলে খড়ের গাদায় শুয়ে পড়ল ও গুণী বন্ধুর জন্যে কিছু করতে পারার খুশিতে বিভোর।

গোলাঘরের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত তন্ন-তন্ন করে খুঁজে একটা নয়, দু'দুটো ডিম নিয়ে এলো তুহীন।

'ঠিক আছে, বলল দিলু, তুমি একটা নাও, আমি নিচ্ছি একটা। এই একটা নিলেই এক ডজন পুরো হয়ে যাবে আমার। তারপর কাল থেকে নতুন করে শুরু হবে আমাদের হিসাব। এই যে এইখানটায় চক দিয়ে আমার দাগের পাশে দাগ দিয়ে রাখো।' পুরনো একটা গম ঝাড়ার মেশিনের গায়ে আঁকা সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখাল ও আঙুল তুলে। তুহীনের দাগ দেয়া হয়ে গেলে ওপরে কোম্পানীর নাম লিখল দিলু হাসতে হাসতে:

দিলদার বেগ অ্যান্ড কোং

ডিমদুটো আসিয়ার ভাঁড়ারঘরে জমা দিয়ে আবার বেরোলো ওরা। দুটো ঘোড়া, ছ'টা গরু আর তিনটে বাছুরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তুহীনকে নিয়ে এলো দিলু একটা বুড়ো বটগাছের কাছে। ছোট্ট একটা ঝর্নার ওপর ঝুঁকে পড়েছে ওর একটা ডাল, মনে হয় কুশলাদি জিজ্ঞেস করছে বুঝি।

সীমানা দেয়ালের ওপর দাঁড়িয়ে বটের ঝুরি ধরে সহজেই মোটা তিনটে ডালের মাঝখানে চওড়া, সমতল একটা জায়গায় উঠে এলো

ওরা। গাছের গায়ে একটা গর্তে কয়েকটা বই রাখা আছে, গোটা কয়েক অর্ধসমাপ্ত বাঁশী আর একটা নৌকার মডেল থেকে খুলে রাখা কিছু তক্তা দেখা গেল।

‘এটা কাঞ্চন আর আমার আস্তানা। আমরাই আবিষ্কার করেছি জায়গাটা। আমাদের অনুমতি না নিয়ে মণি ছাড়া আর কেউ আসতে পারে না এখানে। মণি এলে আমরা কিছু মনে করি না।’

চমৎকার লাগল তুহীনের পরিবেশটা। নিচে নাচতে নাচতে ছুটছে ঘোলাটে পানি, বটগাছ ছেয়ে গেছে ফুলে-ফলে, চারপাশে মৌমাছির গুঞ্জন, বাতাসে মিষ্টি সুবাস।

‘অপূর্ব!’ বলে উঠল তুহীন। আমাকে মাঝে-মধ্যে যদি এখানে আসতে দাও তাহলে আমার খুব ভাল লাগবে। এত সুন্দর জায়গা আমি জীবনে দেখিনি। ইশ্, পাখি হয়ে যদি থেকে যেতে পারতাম এই গাছে!’

‘সত্যিই চমৎকার জায়গাটা। তুমি আসতে পার, কাঞ্চনের আপত্তি না থাকলে যখন খুশি তুমি আসতে পার এখানে। আমার মনে হয় না ও আপত্তি করবে। কাল রাতে বলছিল তোমাকে ওর খুব ভাল লেগেছে।’

‘তাই বলেছে?’ হাসি ফুটল তুহীনের শীর্ণ মুখে। এরই মধ্যে ও টের পেয়েছে কাঞ্চনের মতামতকে দাম দেয় এখানকার সবাই; কিছুটা জুলিখালার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলে, আর কিছুটা ওর শান্ত, গম্ভীর, ন্যায়নিষ্ঠ আচরণের জন্যে।

‘হ্যাঁ। চুপচাপ মানুষ পছন্দ করে কাঞ্চন। আর যদি ওর মত বইয়ের পোকা হতে পার, তাহলে তো সোনায় সোহাগা।’

খুশি বুঁজে এলো তুহীনের। আমতা আমতা করে বলল, ‘কিন্তু আমি যে ভাল পড়তে পারি না। বেহালা বাজাতে গিয়ে সময় হয়নি লেখাপড়ার।’

অবাক হয়ে তাকাল দিলু বারো বছর বয়েসী একটা ছেলে পড়তে জানে না শুনে। সামলে নিয়ে বলল, ‘পড়তে আমারও ভাল লাগে না। কোনও মতে কাজ চালিয়ে নিই আর কি।’

‘অবশ্য স্বরলিপি পড়তে পারি, বলল তুহীন মিনমিন করে।’

‘আমি পারি না,’ অকপটে স্বীকার করল দিলু।

‘আগে কখনও লেখাপড়ার সুযোগ হয়নি। এখানে আমি মন দিয়ে পড়ে যতটা সম্ভব শিখতে চাই। রহমান খালু কি খুব কঠিন পড়া দেন?’

‘আরে না!’ মাথা নাড়ল দিলু। না পারলে একটুও রাগ করেন না উনি, বরং আবার বুঝিয়ে দেন, তাও না পারলে আবার; কঠিন জায়গাগুলো উতরে যেতে সাহায্য করেন, সাহস যোগান। ওরেকব্বাপ! আমার আগের স্কুলের টিচার? একটু ভুল করলে মাথায় অ্যায়সা রাম গাঁট্টা লাগাত!’ চট করে মাথায় হাত বুলিয়ে নিল ও যেন এইমাত্র একটা গাঁট্টা খেয়েছে।

গাছের গায়ের গর্ত থেকে একটা বই নিয়ে পাতা উল্টাচ্ছিল তুহীন, হঠাৎ বলে উঠল, ‘মনে হচ্ছে, এ-বই আমি পড়তে পারব।’

‘বেশ তো, পড়ো না খানিকদূর; আমি সাহায্য করব,’ উৎসাহ দিল দিলু।

এক পৃষ্ঠার মত পড়ল তুহীন থেমে থেমে, যেখানেই ঠেকল সেখানেই পড়ে দিল দিলু। তারপর সাহস যোগাল, ‘তোমার বেশি দিন লাগবে না, আর সবার মতই গড়গড়িয়ে পড়বে তুমি কদিন গেলেই।’

ঝর্নার ওপারে অনেকগুলো টুকরো জমি দেখে ওখানে কি বোনা হয়েছে জানতে চাইল তুহীন।

‘হরেক রকম ফসল,’ বলল দিলু। ‘ওগুলো আমাদের জমি, মানে, ছাত্রদের। যার যা খুশি লাগাই আমরা ওই জমিতে। একটাই নিয়ম- সবাইকে বুনতে হবে আলাদা আলাদা ফসল। আমরাই পানি দিই, আগাছা পরিষ্কার করি।’

আগ্রহ ফুটল তুহীনের চোখে। ‘তুমি কি বুনেছ এ-বছর?’

মাথাটা পিছনে হেলিয়ে দিয়ে কাল্পনিক দাড়িতে আঙুল চালাতে চালাতে অবিকল রুস্তম আলীর ভঙ্গিতে জবাবা দিল দিলু, ‘শিম লাগাইছি, স্যার। কারণ ইয়ারচেয়ে সহজ আর কুনো ফসল নাই। গেলবছর লাগাইছিলাম তরমুজ, কিন্তু শালার পুতেরা পাকতে এত দেরি করে, পুকায় দইরা এক্কেরে শ্যাষ। দয়া কইরা একখান তরমুজ বাদ রাখছিল তিনারা।’

হেসে ফেলল তুহীন। হাসতে হাসতে আঙুল তুলে দেখাল ভুট্টা খেতের

দিকে, ‘ওগুলো তো বেশ সুন্দর বাড়ছে দেখা যায়?’

‘হ্যাঁ। কিন্তু খাটনি আছে ওর পেছনে। বহুবার নিড়াতে হয়। কিন্তু শিমের জন্যে লাগে বড়জোর এক কি দুই নিড়ানি, সবজিও ধরে তাড়াতাড়ি।’

‘আমাকেও কি জমি দেয়া হবে?’ জানতে চাইল তুহীন। ভাবছে, ভুট্টা ফলাতে খাটনি যতই হোক, নিশ্চয়ই তৃপ্তিও আছে তেমনি।

‘নিশ্চয়ই দেয়া হবে,’ নিচ থেকে ভারি গলার আওয়াজ ভেসে এলো। রহমান খালু। পায়চারি শেষ করে ফিরে এসেছেন তিনি, এখন খুঁজছেন ওদের। প্রত্যেক ছাত্রর সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও একান্তে আলাপ করেন তিনি ছুটির দিন।

প্রত্যেকে মনে করে রহমান খালু তাকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন। নিজের ভাবনা, পরিকল্পনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, অনাগত ভবিষ্যৎ এসব নিয়ে একজন বড় মানুষের সঙ্গে একান্তে আলাপ করার সুযোগ পেয়ে ছাত্ররা সবাই কৃতার্থ বোধ করে। অসুখে-বিসুখে ছুটে আসে ওরা জুলিখালার কাছে, কিন্তু জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সাধনায় প্রতি পদে তাদের প্রয়োজন রহমান খালুকেই।

তড়বড় করে নামতে গিয়ে ঝপাৎ করে পানিতে পড়ল দিলু। কিন্তু বিন্দুমাত্র বিব্রত না হয়ে গোটা দুই ডুব দিয়ে উঠে এলো সে তীরে, কাপড়টা পাল্টে আসি বলে রওনা হয়ে গেল বাড়ির পথে। তুহীন চলল

রহমান খালুর সঙ্গে ছাত্রদের চাষের জমি দেখতে। প্রথম সুযোগেই তুহীনের অন্তর জয় করে নিলেন তিনি ওকে চমৎকার একখণ্ড জমি দান করে। শুধু তাই নয়, কোন ফসলের কি গুণ, কি ধরনের পরিচর্যা প্রয়োজন—এসব ব্যাপারে ওর সঙ্গে এতই গুরুত্বের সাথে আলাপ করলেন, যেন এই ফসলের ওপরই নির্ভর করছে গোটা পরিবারের ভরণপোষণ। চাষাবাদের বিষয় থেকে আরও নানান বিষয়ে গেলেন ডক্টর রহমান, কথায় কথায় অনেকগুলো চিন্তার খোরাক ঢুকিয়ে দিলেন তুহীনের মাথায়, লক্ষ করলেন, যা বলছেন তাই ব্লটিং পেপারের মত শুষে নিচ্ছে ছেলেটা।

সন্ধের পর খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সবাই ওরা যখন হলরূমে জড় হলো, তুহীনের মনে হলো, কোথায় স্কুল, এটা তো একটা পরিবার। টুকিটাকি নানান কথার পর গানের আসরের জন্যে তৈরি হলো সবাই। পিয়ানোতে বসলেন জুলিখালা, গিটার তুলে নিলেন রহমান খালু, স্কেল ঠিক হয়ে যেতে মোটা একটা বাঁশী বের করল খলিল তার ব্যাগ থেকে, পিয়ানোর নোটের সঙ্গে মিল করে সুর বেঁধে নিল তুহীন বেহালায়। সুরেলা কনসার্টের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সবাই গাইল গান। তুহীনের মনে হলো গানটা আসল কথা নয়, আসলে গানের মাধ্যমে ওদের আত্মার মিলন হলো পরস্পরের সঙ্গে। একাত্ম হলো ওরা।

গানের শেষে সবার কপালে চুমো দিলেন জুলিখালা। এবার স্নান

সেরে ঘুমাতে যাবে সবাই। আগামী কাল থেকে আবার ছয় দিন লেখাপড়া।

অনেকদিন পর রাতে মিষ্টি একটা স্বপ্ন দেখল তুহীন।

চার

পরদিন সকালে যখন স্কুলঘরে ঢুকল তখন বুক কাঁপছে তুহীনের। এটাই ওর জীবনের প্রথম স্কুল, প্রথম ক্লাস। আর খানিক বাদে সবার সামনে প্রমাণ হয়ে যাবে যে ও কিচ্ছু জানে না। কিন্তু ঘরে ঢুকতেই একটা জানালার ধারে, সবার থেকে একটু আলাদা বসালেন ওকে রহমান খালু। ওখানে আলাদা করে ওর পড়া ধরার জন্যে হাজির থাকলেন খলিল ভাই। ফলে কোনরকম বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হলো না ওকে। কৃতজ্ঞচিত্তে মন দিল ও পড়া তৈরির কাজে।

ওর চেহারায় ঐকান্তিক আগ্রহের ছাপ আর কালি মাখা আঙুল দেখে মৃদু হেসে ওর পিঠে হাত রাখলেন রহমান খালু।

‘বেশি পরিশ্রম কোরো না, বাপ, ক্লান্ত হয়ে পড়বে। তাড়াহুড়োর কিচ্ছু নেই—যথেষ্ট সময় আছে হাতে।’

‘কিন্তু আমি যে ওদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছি? ওরা কত কি জানে, আর আমি?’ কাঁদো কাঁদো গলায় বলল তুহীন, ‘আমি তো কিচ্ছু জানি না।’

রহমান খালু বুঝলেন, আশেপাশের ছেলেদের ব্যাকরণ, ইতিহাস আর ভূগোলের পাঠ গড়গড় করে বলে যেতে দেখে বেচারা ঘাবড়ে গেছে একেবারে। ওর পাশে বসে বললেন, ‘তুমি আবার এমন কিছু জানো যা ওরা একটুও জানে না।’

‘তাই নাকি?’ বিশ্বাস হতে চায় না তুহীনের।

‘হ্যাঁ। এই যেমন ধরো, তুমি বেহালা বাজাতে পার, ওরা পারে না। তুমি যে-কোনও অবস্থায় তোমার মেজাজ ঠিক রাখতে পার, কিন্তু গাজী ফরিদ অঙ্কে ভাল হলে কি হবে, মেজাজটা নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। তোমার যতটা শেখার আগ্রহ আছে, ওদের অনেকেরই ততটা নেই। ওরা কেউ কি এক সপ্তাহ বা একমাসের মধ্যে তোমার মত বেহালা বাজানো শিখে ফেলতে পারবে? পারবে না। তেমনি তুমিও চট্ করে সব পড়া শিখে ফেলতে পারবে না। কিছু শিখতে হলে সময় লাগে, ধৈর্য লাগে, পরিশ্রম লাগে। তুমি যদি হতাশ না হয়ে লেগে থাক, দেখবে যতই দিন যাবে ততই সহজ হয়ে আসবে সবকিছু! ওদের ধরে ফেলতে তোমার খুব বেশি সময় লাগবে না।’

পরিষ্কার বুঝতে পারল তুহীন, ও যা জানে সেটাও মূল্যহীন নয়। বিসকে উপসাগর কোথায়, বা সাত নং কত এক্ষুণি তা ও বলতে পারবে না, কিন্তু কেউ ওকে নিয়ে হাসাহাসি না করলে শিখে নিতে পারবে অল্পদিনেই। মনে বিরাট একটা ভরসা পেল ও। ঠিক ওর মনের কথাটা বুঝতে পেরে রহমান খালু সবার পড়া থামিয়ে তুহীনের সমস্যাটা বুঝিয়ে বললেন ক্লাসের সবাইকে। ওরা কথা দিল সাধ্যমত সাহায্য করবে ওকে। ফলে দূর হয়ে গেল তুহীনের ক্লাস ভীতি।

মন দিয়ে পড়ছে ও, মন-প্রাণ ঢেলে পরিশ্রম করছে ওর জমির পিছনে, মটরের দানা থেকে পাতা বেরিয়ে এলে আনন্দে লাফায়, যখনই

অবসর পায় বসে যায় বেহালাটা নিয়ে। অল্পদিনেই ওর ফ্যাকাসে, শীর্ণ মুখে লালচে আভা ফুটল, ভাল খাবার ও মনের মত খাটনির কাজ পেয়ে কুঁজো ভাবটা দূর হয়ে সিধে হয়ে গেল শিরদাঁড়া, টানটান হলো বুক।

কাঞ্চন ওর প্রাণের বন্ধু, দিলু পৃষ্ঠপোষক আর দুঃসময়ে মণি হচ্ছে সান্ত্বনাদাত্রী। সবাই বুঝে গেছে ছেলেটা নিরিবিলি চুপচাপ থাকতেই পছন্দ করে, তাই বড়দের দৌড়-ঝাঁপ আর হৈ-হল্লার মধ্যে ওকে কেউ ডাকে না। আসাদ চৌধুরী প্রায়ই ওর জন্যে বই, জামাকাপড় আর উৎসাহ দিয়ে চিঠি পাঠান, মাঝে মাঝে এখানে এসে কতটা কি শিখছে তার খোঁজখবর নেন, কখনও বা শহরে কোথাও কোন সঙ্গীতানুষ্ঠান হলে ওকে নিয়ে যান। ওঁর বিশাল বাড়ির সবাই ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে, বুঝতে দেয় না যে ও বাইরের লোক। আর খাওয়া-দাওয়ার সে কী এলাহী ব্যবস্থা! একদিন খেলে বিশ দিন তার স্বপ্ন দেখতে হয়।

রহমান দম্পতি বড়লোক নন, আসাদ চৌধুরীর মত অঢেল টাকা ওঁদের নেই, কিন্তু ওঁরা জানেন একটা শিশুর মুখে হাসি ফোটাতে খুব বেশি টাকার দরকার হয় না। 'আদর্শ বিদ্যালয়' চালানোর জন্যে কারও কাছে কখনও হাত পাতেন না তাঁরা, তবে কেউ কিছু দান করতে চাইলে ফিরিয়েও দেন না। আশপাশের গ্রামের কৃতজ্ঞ অভিভাবকরা প্রায়ই নিজেদের জমিতে ফলানো নানান কিছু-লাউ, কুমড়ো, কলা, এসব পাঠান; যাঁদের ছেলেমেয়ে এখানে পড়ে না, তাঁরাও টের পেয়ে গেছেন রহমান দম্পতি বেশ কষ্ট করেই স্কুলটা চালান, তাঁরাও যাঁর সামর্থ্যে যা কুলায়

পাঠান। জুলিখালার বান্ধবীরা অনেকেই তাঁদের ছেলেমেয়েদের পরিত্যক্ত খেলনা, ব্যবহৃত জামাকাপড়, রঙীন ছবির বই পাঠিয়ে দেন। বইগুলো যায় স্কুলের লাইব্রেরীতে, পোশাকগুলো ধুয়ে ইস্তিরী করে ড্রয়ারে তুলে রাখেন জুলিখালা, খেলনাগুলো মেরামত করার দায়িত্ব নিয়েছে তুহীন, আর সেগুলোর জন্যে, ছোট ছোট সুন্দর জামা তৈরির ভার নিয়েছে মণি পয়লা বৈশাখের আগের দিন গ্রামের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিলি করা হয় এগুলো।

বই পড়ায় ক্লান্তি নেই কাঞ্চনের, একের পর এক বই পড়ে, আর বটগাছের ডালে বসে তুহীনকে শোনায় সে-সব কাহিনী। অল্প দিনেই রবিনসন ক্রুসো, ট্রেযার আইল্যান্ড, সিন্দবাদ, আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ আর আলীবাবা সহ দুনিয়ার যত ভাল ভাল ক্লাসিক আছে, সব জানা হয়ে গেল তুহীনের। দেখা গেল লেখাপড়াতেও সাহায্য করছে ওকে এসব বই। অল্প কয়েক মাসেই প্রায় ধরে ফেলল ও ওর-বয়েসী ক্লাসের আর সবাইকে।

ছাত্ররা নানান কিছু করে যে একটু-আধটু আয় রোজগার করছে, তাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি করেন না রহমান খালু, বরং উৎসাহ যোগান। সবার তো আর সমান অবস্থা নয়, বেশিরভাগই গরীব ঘরের ছেলে-এখন থেকেই কিছুটা স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা তিনি সমর্থন করেন। দিলু ডিম বিক্রি করে, যদিও ও অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, খলিল ছাত্র পড়ায়, সালাউদ্দীন কাঠের আসবাব ও খেলনা তৈরি করে বেচে, গাজী ফরিদ

হাঁস-মুরগী-ছাগল কেনা-বেচা করে।

একদিন তুহীন ছুটে এসে জানতে চাইল, 'খালু, ওই ওদিকে একটা বাড়ির জলছাদ হবে। ওই বাড়ির একটা ছেলে আমার বাজনা শুনেছে। বলছে আগামী কাল ছাদ পিটাবার সময় ওদের সঙ্গে বেহালা বাজালে টাকা দেবে। যাব?'

সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় কাত করলেন রহমান খালু। 'যাও। ভালই তো। তোমারও ভাল লাগবে, ওদেরও ভাল লাগবে—সেই সাথে কিছু হাতখরচাও রোজগার হয়ে যাবে। আমি তো এরমধ্যে খারাপ কিছু দেখি না।'

পরদিন বিকেল বেলা ফিরে যখন এলো, দুই কান পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে তুহীনের হাসি। পঁচিশ টাকা দিয়েছে ওরা ওকে, বাড়ির গিন্নী ঘরে ডেকে নিয়ে পেট পুরে ভাত খাইয়েছেন, আসার সময় এক ঠোঙা জিলেপিও গুঁজে দিয়েছেন হাতে। সবাই খুব আদর করেছে—এমন কি ছাদ পেটাতে আসা মহিলারাও।

সব শুনে হাসলেন রহমান খালু। 'এই তো, তুমিও একটা পার্টটাইম পেশা পেয়ে গেলে। দিলু আর ফরিদের মত তোমারও শুরু হয়ে গেল রোজগার। ভাল বাজিয়ে থাকলে দেখবে আবারও ডাক আসবে আরেকখান থেকে। যাবে, তবে শুধুমাত্র শুক্রবার, কেমন?'

নোটগুলো পকেটবইয়ের পাতার ভাঁজে পুরে বুকপকেটে রেখে দিল

ও। ওর কাছে মনে হচ্ছে, কোটিপতি হতে আর বেশি দেরি নেই। নিজের রোজগার গর্বে ফুলেউঠেছে ওর বুকটা।

প্রথমেই মণিকে খুঁজে বের করে ওর হাতে দিল চারটে জিলেপি, তারপর সুমন আর সুজনকে দিয়ে যা বাঁচল ভাগ করে খেল দিলু আর কাঞ্চনকে নিয়ে।

বুক পকেটে রাখা টাকাগুলোর গরম একটু কমতে নোটগুলো রহমান খালুর কাছে জমা দিল তুহীন। বলল, 'এইভাবে জমাতে জমাতে অনে-ক টাকা হলে একদিন নতুন একটা বেহালা কিনব আমি।'

'বেশ তো, কিনো।' ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন খালু।

জীবনটা নতুন আশা. আনন্দ আর উৎসাহে ভরে উঠছে তুহীনের। অঙ্ক আর ড্রইং ক্লাসে খুব ভাল করতে না পারলেও গানের ক্লাসে ও একনম্বর। অন্যান্য বিষয়ে আজকাল নম্বর পাচ্ছে ও ষাটের ওপর। পড়া না পারলে শাস্তি যে পায় না তা নয়। তবে মারধর কিছু না, একদিন বেহালা বাজানো বন্ধ হয়ে যায় ওর। আর বাজনা বন্ধ হয়ে গেলে মনে হয় ওর দমই বন্ধ হয়ে আসছে।

বার কয়েক জোর করে মন বসিয়ে আস্তে আস্তে যখন ও বুঝতে পারল, একটু চেষ্টা করলেই পারা যায়, তখন বাড়তে শুরু করল ওর আত্মবিশ্বাস। বার দুয়েক বেহালা বন্ধের পর দেখা গেল কোনও পড়াতেই তুহীন আর পিছিয়ে নেই।

গান-বাজনার ভক্ত মণি। সঙ্গীত-শিল্পী হিসেবে দারুণ ভক্তি ওর তুহীনের ওপর। প্রায়ই দেখা যায় তুহীন যখন বেহালা প্র্যাকটিস করে, ওর দরজার পাশে সিঁড়ির ধাপে বসে এক মনে সেলাই করছে মণি, কিংবা দুলে দুলে ঘুম পাড়াচ্ছে ছোট পুতুলটাকে। ব্যাপারটা তুহীনের দারুণ লাগে। নীরব শ্রোতাটির জন্যে সাধ্যমত ভাল বাজাবার চেষ্টা করে ও।

পিতার যত্নে তুহীনকে মানুষ করছেন ডক্টর রহমান, ওর মধ্যে অনেক ভাল গুণের সমাবেশ লক্ষ করে খুশি হয়ে আরও কিছু গুণের উন্মেষ ঘটাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ইদানীং ওর একটা বিশেষ দোষের কথা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় খালা-খালু দুজনেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। জানা গেছে, মিথ্যে বলার বদভ্যাস আছে ওর। ডক্টর রহমান জানেন, অবিবেচক পিতার বেধড়ক মারপিটের ভয়ে মিথ্যা বলা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে বেচারার, কিন্তু তাই বলে এটা তো আর মেনে নেয়া যায় না। খুব জঘন্য মিথ্যে অবশ্য বলে না, কিন্তু মিথ্যা তো মিথ্যাই, সবাই জানে এটা খারাপ। এই দোষটা মানুষের সামাজিক মর্যাদা ও আত্মমর্যাদা দুটোই একেবারে ধ্বংস করে দেয়।

‘যতই সাবধান হও না কেন, মিথ্যে বলে পার পাওয়া যায় না,’ পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে একদিন বললেন ডক্টর রহমান। ‘তোমার মুখ, তোমার চোখ, তোমার হাত, তোমার অঙ্গভঙ্গি বলে দেবে মানুষকে—যা বলছ তা সত্যি নয়।’

‘জানি। আমি মুখ সামলে রাখতে চেষ্টাও করি। কিন্তু পারি না,’ কাচুমাচু ভঙ্গিতে বলল তুহীন। ‘একটু মিথ্যে বললে যদি অনেক বড় ঝামেলা থেকে বাঁচা যায়, সেই আশাতেই বলি। আসলে আব্বা আর কাদের মিয়াকে এত ভয় পেতাম যে মিছেকথা বলে পার পাওয়ার চেষ্টা করতাম। এখনও মাঝে মাঝে বলে ফেলি ছেলেদের টিটকারী থেকে বাঁচার জন্যে। আমি জানি এটা খারাপ, কিন্তু বলার সময় ভুলে যাই।’ কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল ওর চেহারাটা।

‘আমি যখন ছোট ছিলাম, আমিও মিছেকথা বলতাম, বললেন রহমান খালু। কারণে-অকারণে জঘন্য সব মিছেকথা! আমার দাদী এই দোষ থেকে বাঁচিয়েছিলেন আমাকে। আমার আব্বাআম্মা অনেক বুঝিয়েছেন, আমার কারণে মানুষের কাছে লজ্জা পেয়েছেন, কখনও কঠোর শাস্তি দিয়েছেন আমাকে, কিন্তু তোমার মত আমিও ভুলে যেতাম। শেষে দাদী বললেন: আমি তোমার মনে রাখার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। দেখবে, আমার চিকিৎসা নিলে মিথ্যে বলার জন্যে জিভটা নড়ে উঠলেই মনে পড়ে যাবে যে কাজটা ঠিক হচ্ছে না। এই বলে আমার জিভটা টেনে ধরে কুচ করে কাঁচি দিয়ে কেটে দিলেন।’

‘অ্যাঁ?’ চমকে উঠল তুহীন।

‘সামান্য একটু। কিন্তু তাতেই রক্ত বেরিয়ে যা-তা অবস্থা। পাঁচ-ছয় দিন ব্যথা থাকল, কিন্তু সেই ব্যথা অনেক উপকার করল আমার। জিভ নড়লেই ব্যথা লাগে, তাই ধীরে ধীরে বলতে হলো কথা, আর তার ফলে

কোন কথাটা বলা ঠিক, কোনটা ঠিক না-চিন্তা করার সুযোগ পাওয়া গেল। তাছাড়া ইয়াব্বড় ওই কাঁচিটার কথা মনে এলেই আত্মা চমকে উঠত। সাবধান হয়ে গেলাম সেই থেকে। কাজটা নিষ্ঠুরতার মত শোনালেও আসলে আমার দাদী কিন্তু অসম্ভব ভালবাসতেন আমাকে, আমারই ভালর জন্যে ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাঁকে করতে হয়েছিল কাজটা। দাদী যখন মারা যান, তখনও তিনি দোয়া করে গেছেন: আল্লাহ, আমার ছোট্ট আবদুর রহমান যেন চিরকাল সত্যবাদী থাকে!'

কথাটা বলতে বলতে চোখে পানি এসে গেল রহমান খালুর। অবাক হয়ে দেখল তুহীন, বুঝল গল্প নয়, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাই বলছেন খালু। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে কি সব ভাবল। তারপর নিচু গলায় বলল, 'আমার কোনদিন কোনও দাদী ছিল না। কিন্তু আপনি যদি মনে করেন এতে আমার উপকার হবে, তাহলে জিভ কাটতে দিতে রাজি আছি আমি।'

ব্যথার ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা, তবু মেনে নিতে চাইছে কষ্টটা। ডক্টর রহমান বুঝলেন, ছেলেটার সদিচ্ছায় কোনও খাদ নেই।

মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন তিনি।

'জিভ কাটার চেয়ে ভাল একটা বুদ্ধি আছে, বললেন তিনি। তুমি যদি আর কখনও মিছেকথা বলে ফেল, তাহলে তোমাকে আমি শাস্তি দেব না, বরং তুমিই আমাকে শাস্তি দেবে।'

‘কি করে?’ চমকে উঠল তুহীন। ‘আমি কি শাস্তি দেব?’

‘সহজ শাস্তি, বেত মারবে আমাকে। আমি কাউকে মারি না। তাছাড়া মার তো তুমি আগে অনেক খেয়েছ। এবার আমাকে ব্যথা দিয়ে দেখো, হয়তো মনে রাখতে সুবিধে হবে।’

‘আপনাকে মারব? অসম্ভব! সেটা আমি পারব না!’

‘তাহলে তো জিভটা তোমার সামলে রাখতে হবে, বাপ। ব্যথা পেতে আমার ভাল লাগে না-সত্যি বলতে কি, ভয়ই লাগে। কিন্তু তুমি তো আমারই প্রিয় ছাত্র, তোমার দোষটা দূর করার জন্যে আমি খুশি মনেই সহ্য করব ব্যথা।’

এই কথায় তুহীন এতটাই নাড়া খেল যে এরপর বহুদিন সামলে রাখল নিজের জিভটা। ঠিকই বুঝেছিলেন রহমান খালু, শাস্তির ভয় থেকে তুহীনের মনে তাঁর প্রতি ভালবাসা অনেক জোরাল ভাবে কাজ করবে। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। একদিন রাগে অন্ধ হয়ে গিয়ে তপন মিত্র যখন আঙুল তুলে শাসাল, ভুট্টার খেত মাড়িয়ে যে ওর ফসল নষ্ট করেছে তাকে স্রেফ পিটিয়েই খুন করে ফেলবে; তখন সাহস হারিয়ে ফেলল তুহীন, অস্বীকার করে বসল। বলতে পারল না, গত রাতে গাজী ফরিদের তাড়া খেয়ে ও কমোডোরের খেত মাড়িয়ে ফসল নষ্ট করেছে।

ভেবেছিল কেউ টের পাবে না। কিন্তু দিলু দেখেছিল। দুদিন পর তপনের আহাজারি শুনে দিলু বলে দিল ও দেখেছে, কাজটা তুহীনের।

কথাটা শুনে ফেললেন ডক্টর রহমান। প্রথম শিফট শেষ হওয়ার পর সবাই তখন হলরূমে। রহমান খালু তৈরি হচ্ছেন দুই ছেলের সঙ্গে প্রাত্যহিক কুস্তির জন্যে। দিলুর কথা শুনে চট্ করে চাইলেন তুহীনের দিকে দেখলেন, লজ্জায় লাল হয়ে গেছে তুহীনের মুখ, ভয়ে-ভয়ে চাইছে তাঁর দিকে আস্তে করে সুমনকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বললেন, 'তোমার আম্মুর কাছে যাও তো, বাপ। একটু পরেই আসছি আমি।' তারপর তুহীনের একটা হাত ধরে স্কুল ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

এক মিনিট নড়ল না কেউ, এ-ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে কি ঘটতে চলেছে। দিলু বেরিয়ে গিয়ে একটা জানালায় উঠে উঁকি দিল পর্দার ফাক দিয়ে। দেখল, ডেস্কের ওপর রাখা ধুলোমাখা বেতটা তুলে নিলেন রহমান খালু!

'সেরেছে! আকাশ ভেঙে পড়বে এবার তুহীনের পিঠে! বলে দেয়াটা বোধহয় ঠিক হলো না।' মন খারাপ হয়ে গেল দিলখোলা দিলুর। মার খাওয়ার চেয়ে লজ্জার আর কিছু নেই এই স্কুলে, কারণ কেউ কখনও মার খায় না এখানে।

'তোমাকে কি বলেছিলাম, মনে আছে?' রাগ নয়, বিষাদ ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন রহমান খালু।

'হ্যাঁ, কিন্তু আমাকে মাফ করে দিন, খালু, প্লিজ! আমি পারব না!'

পিছিয়ে যাচ্ছে তুহীন, দুই হাত কোমরের পিছনে বেঁধে রেখেছে, তিরতির করে কাপছে গালের পেশি।

‘ব্যাটা এরকম করে কেন,’ ভাবছে দিলু। ‘আমি হলে পুরুষ মানুষের মত পিঠ পেতে হজম করতাম সব পিট্টি।’

‘আমাকে আমার কথা রাখতে হবে, তুহীন। তোমার যেমন মনে রাখতে হবে, যে-কোনও পরিস্থিতিতে মিথ্যে বলা চলবে না, সত্যি কথা বলতে হবে। যা বলছি করো, তুহীন। এটা নিয়ে খুব জোরে ছয়টা বাড়ি মারো আমার হাতে।’

আঁৎকে উঠল দিলু কথা শুনে। পড়েই যাচ্ছিল জানালা থেকে, কোনও মতে সামলে নিয়ে ঝুলে থাকল। ছানাবড়া হয়ে গেছে দুই চোখ, হাঁ করে গিলছে ভিতরের দৃশ্য।

বেতটা হাতে নিতে বাধ্য হলো তুহীন। ডক্টর রহমান যখন এভাবে আদেশ করেন, সেটা না মেনে উপায় থাকে না কারও। অনুশোচনায় দগ্ধ বেচারা দুটো দুর্বল বাড়ি দিল রহমান খালুর পেতে দেয়া হাতে, থামল, চোখের পানিতে অন্ধ হয়ে গেছে প্রায়।

শান্ত কণ্ঠে বললেন রহমান খালু, ‘মারতে থাকো। এত আস্তে চলবে না, আরও জোরে!’

জামার আস্তানে চোখ মুছে নিয়ে জোরে আরও দুটো বাড়ি দিল তুহীন। দেখল লাল হয়ে উঠেছে হাতটা, প্রতিটা বাড়ির সাথে সাথে ব্যথায়

চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে খালুর, কুঁচকে যাচ্ছে গাল; কিন্তু তার চেয়েও বেশি ব্যথা লাগছে তুহীনের নিজের বুকে।

'আর না, খালু, যথেষ্ট হয়েছে!' ফুঁপিয়ে উঠল তুহীন।

'আরও দুটো,' বললেন ডক্টর রহমান।

কোনও মতে আরও দুটো বাড়ি দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল তুহীন বেতটা । তারপর দুইহাতে রহমান খালুর হাতটা ধরে নিজের গালে ঠেকাল। ফোঁপাচ্ছে আর বলছে, 'আর কোনদিন ভুল হবে না, খালু! আপনি দেখবেন, আর কোনদিন ভুল হবে না আমার!'

একহাতে ওকে জড়িয়ে ধরলেন রহমান খালু। 'আল্লার কাছে প্রার্থনা করো, যেন তিনি তোমাকে সত্যি বলতে সাহায্য করেন। চেষ্টা কোরো, যেন এরকম ঘটনা আর কখনও না ঘটে।'

আর কি ঘটল বলতে পারবে না দিলু, এইটুকু দেখেই জানলা, থেকে নেমে ফিরে এলো হলরূমে। সবাই ঘিরে ধরল ওকে, জানতে চায় কি ঘটল তুহীনের কপালে।

চাপা গলায় সবই জানাল দিলদার বেগ। তারপর বলল, 'অনুশোচনায় কেঁদে খুন হয়ে যাচ্ছে বেচারা তুহীন। ওকে এ ব্যাপারে আর কিছু বলা আমাদের উচিত হবে না, কি বলো?'

'তা না হয় হলো,' বলল কাঞ্চন, রেগে গেছে অন্যের দোষে ওর সবচেয়ে প্রিয় খালুকে মার খেতে হয়েছে জেনে, 'বলব না কিছু। কিন্তু

মিছেকথা বলা সত্যিই খুব খারাপ অভ্যাস।'

খলিল ভাই বলল, 'এসো, আমরা এখান থেকে কেটে পড়ি। ওর জন্যে আলগোছে ওপরে চলে যাওয়া সহজ হবে।'

প্রস্তাবটা সবার পছন্দ হওয়ায় গোলাঘরের দিকে সরে গেল ওরা।

দুপুরে খেতে এলো না আজ তুহীন। জুলিখালা নিজে ওর জন্যে খাবার নিয়ে গেলেন ওপরে। মাথা নিচু করে রাখল তুহীন, খালার চোখের দিকে তাকাতে পারল না। অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছে। দু'একটা মিষ্টি কথায় ওকে সান্ত্বনা দিলেন জুলিখালা। বারবার করে বলে গেলেন যেন খাবারটুকু অবশ্যই খেয়ে নেয়।

মায়েরা বোধহয় এমনই হয়, ভাবল তুহীন। সব দোষ মাফ করে দেয়ার আশ্চর্য গুণ থাকে তাদের। এত বড় একটা অপরাধের পরেও জুলিখালা ওর খাওয়ার কথাটা মনে রাখলেন কি করে!

বিকেলের দিকে আলগোছে দরজাটা খুলে সবার চোখের আড়ালে কোথাও সরে যেতে চেয়েছিল তুহীন, দেখল চুপচাপ সিঁড়ির ওপর বসে আছে মণি, হাতে সেলাইও নেই, পুতুলও নেই। মেয়েটির সহানুভূতি ওকে গভীর ভাবে স্পর্শ করল। অন্তত একজন তাহলে ওকে বাজে ছেলে বলে মনে করছে না।

'আমি হাঁটতে যাচ্ছি, সহজ গলায় বলল ও, তুমি আসবে?'

'হ্যাঁ,' খুশি হয়ে বলল মণি। 'আমি এক দৌড়ে জুলিখালাকে বলে

আসছি।'

খেলার মাঠ থেকে ওদের দুজনকে দেখতে পেল সবাই। ছোট্ট মণির জন্যে আরও একবার গভীর ভালবাসা অনুভব করল ওরা সবাই। যখনই কেউ কোনও কারণে দুঃখ পায়, লজ্জা পায় বা কোন বিপদে পড়ে; সবসময় দেখা যায় শান্ত, নম্র মণি এসে দাঁড়ায় তার পাশে।

হাঁটাহাঁটি করে অনেকটা শান্ত হয়ে এলো তুহীনের বিপর্যস্ত মন। যখন ফিরে এলো, দেখা গেল মণির হাতে একগাদা পলাশ আর কৃষ্ণচূড়া ফুল। ছোট্ট বন্ধুর জন্য ওগুলো গাছে উঠে কে পেড়ে দিয়েছে বুঝতে অসুবিধে হলো না কারও।

দুপুরের ঘটনার কথা কেউ কোনদিন উচ্চারণ করেনি আর। তার ফলে তুহীনের জন্যে অনেক সহজ হলো নিজের ত্রুটি শুধরে নেয়া। তাছাড়া একান্ত মনে আল্লার কাছে প্রার্থনার সুফল তো আছেই; যার যা প্রয়োজন, চাইলে তিনি তাকে দেন। তারওপর ওকে মনে রাখতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছে আর একটি ব্যাপার-যখনই রহমান খালুর হাত ধরেছে তখনই মনে পড়েছে, ওর ভালর জন্যে কতটা ব্যথা সহ্য করেছে ওই হাত।

পাঁচ

‘কি হয়েছে, মণি?’ মণির মন খারাপ দেখে জানতে চাইলেন জুলিখালা।

‘ছেলেরা আমাকে খেলায় নিচ্ছে না।’

‘কেন নিচ্ছে না?’

‘বলছে, মেয়েরা ফুটবল খেলতে পারে না।’

‘পারে, আমি তো খেলেছি!’ বললেন জুলিখালা। বলেই হেসে ফেললেন ছেলেবেলার দস্যিতার কথা মনে পড়ায়।

‘আমিও খেলেছি, কাঞ্চনের সঙ্গে। কিন্তু ও-ও এখন বারণ করছে। বলে, সবাই হাসবে আমি মাঠে নামলে।’

‘কথাটা একেবারে ভুল বলেনি ও তোমরা দুজন খেললে এক কথা, কিন্তু মাঠে বড়দের সঙ্গে খেলতে গেলে ব্যথা পাওয়ার ভয় আছে। তোমার জন্যে অন্য কোন খেলা আমার ভেবে বের করতে হবে।’

‘সারাক্ষণ একা-একা পুতুল খেলতে আমার বিচ্ছিরি লাগে!’

‘ঠিক আছে, সময় পেলে আমি খেলব তোমার সঙ্গে। আজ অবশ্য পারব না। অনেক কাজ আছে, তাছাড়া শহরে যাচ্ছি আজ আমরা। আমি তোমার নানীর ওখানে যাচ্ছি, তোমাকে তোমার মায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে যাব। ইচ্ছে করলে তুমি ক’দিন থাকতে পার মার কাছে।’

‘যাব, কিন্তু মা আর মিলিকে দেখেই আমি ফিরে আসতে চাই। তা

নইলে একা-একা কাঞ্চনের খুব খারাপ লাগবে। তাছাড়া এখানে থাকতেই আমার বেশি ভাল লাগে।'

'কাঞ্চনকে ছাড়া তুমি থাকতে পার না, তাই না?'

'না, পারি না তো। আমরা যমজ বলে দুজন দুজনকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসি।' ভাইয়ের প্রসঙ্গ এসে পড়ায় খুশি হয়ে উঠল মণি। কিন্তু জুলিখালা উঠে পড়লেন।

'আমি তো কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ব এখন। তুমি কি করবে?'

'কি জানি! ভাল লাগছে না কিছুই।'

'এক কাজ করো না, রান্নাঘরে গিয়ে দেখে এসো কি রান্না হচ্ছে আজ। আসিয়ার মেজাজ ভাল থাকলে ও হয়তো তোমাকে কিছু করতে দিতে পারে।'

'ঠিক আছে, দেখে আসছি।' ধীর পায়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল মণি, কিন্তু একটু পরেই ফিরে এলো উত্তেজিত হয়ে হাতে ছোট একতাল আটার লেচি, ছোট্ট নাকের ডগায় লেগে আছে শুকনো ময়দা। 'খালা, আমি আমার পুতুলদের জন্যে কয়েকটা রুটি বানাই? আসিয়া বু বলছে, খালাকে জিজ্ঞেস করে বানাও।'

'ঠিক আছে, বানাও গে যাও। তবে আসিয়া যখনই বলবে এবার যাও, তখনই চলে আসবে, কেমন?'

'আচ্ছা, বলেই নাচতে নাচতে ছুটল মণি।

ঘর-কন্নার কাজে অফুরন্ত উৎসাহ মণির। জুলিখালা মনে মনে ঠিক করলেন ওর জন্যে মিনি সাইজের হাড়ি-চুলো কিনে দেবেন। সত্যিই আগুন জ্বলবে ওই চুলোয়, রান্নাও করা যাবে অল্পস্বল্প। এতই যখন শখ, শিখুক রান্না-বান্না, সপ্তাহে অন্তত তিনটে দিন রান্না শেখাবেন তিনি ওকে। একা-একা ছোট্ট একটা মেয়ের তো খারাপ লাগারই কথা। আর একটা মেয়েকে এনে রাখতে পারলে খুব ভাল হতো। ভাবলেন, পরামর্শ চাইবেন স্বামীর কাছে।

‘খালা, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে, জরুরী। আপনার সময় হবে এখন?’

লিখছিলেন, তুহীনের গলা শুনে চোখ তুললেন জুলিখালা। ঘরের দরজা দিয়ে মাথা গলিয়ে দিয়েছে ও। গত আধঘণ্টায় এটা হচ্ছে পঞ্চম মাথা।

‘বলে ফেল, তুহীন। জলদি, কাজ আছে মেলা।’

দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে এলো তুহীন। ‘সালাম এসেছে।’

‘সালাম কে?’

‘খচ্চর সালাম। একটা ছেলে। যখন রাস্তায়-রাস্তায় বেহালা বাজাতাম তখন থেকে চিনি ও তখন খবরের কাগজ বিক্রি করত। আমাকে নানান ভাবে সাহায্য করত। এই সেদিন শহরে দেখা হয়ে গেল আবার। ওকে আমি বলেছি কি সুন্দর পরিবেশ এখানে, সবাই কত ভাল; তাই ও

এসেছে।'

'কিন্তু এখানে এভাবে হুট করে বেড়াতে আসার তো নিয়ম নেই, তুহীন।'

'বেড়াতে না, আপনি অনুমতি দিলে ও-ও এখানে থাকতে চায়।'

থতমত খেয়ে গেলেন জুলিখালা ওর সোজাসাপ্টা প্রস্তাবে। কি বলবেন বুঝতে না পেরে শুরু করলেন, 'কই, এরকম কিছু তো আমি জানি না...' আর বলার কিছু না পেয়ে থেমে গেলেন।

'কেন, আমি তো জানতাম গরীব ছেলেমেয়েদেরকে আদর করে এখানে জায়গা দিতে আপনি ভালবাসেন, এই আমাকে যেমন দিয়েছেন!' যেন অবাক হয়ে গেছে তুহীন এখন অন্যরকম দেখে।

'ঠিকই ধরেছ তুমি,' একটু সামলে নিয়ে বললেন জুলিখালা। 'কিন্তু আগে তাদের সম্পর্কে জানতে হবে তো আমার। বুঝতে হবে কে ছেলেটা, কেমন ছেলে। বাছাই করে নিতে হবে আমাকে, কারণ সংখ্যায় ওরা অনেক, কিন্তু অত জায়গা নেই এখানে।'

'আমি ওকে আসতে বলেছিলাম আপনার ভাল লাগবে মনে করে। জায়গা না থাকলে কি আর করা, ফিরে যাবে ও।'

হতাশ হয়েছে তুহীন। জুলিখালা সম্পর্কে ওর ধারণাটা নাড়া খেয়েছে। একজনের উপকার করতে গিয়ে বিব্রত হতে হচ্ছে বেচারাকে। তাই ঘুরে দাঁড়াবার আগেই বললেন জুলিখালা, 'ছেলেটা সম্পর্কে কি জান বলো

দেখি নামের আগে খচ্চর কেন?'

'জানি না খালা। আসলে ওকে ভাল করে চিনি না আমি। শুনেছিল বড়লোকের ছেলে ছিল, কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টে মা-বাবা মারা যাওয়ার পর আত্মীয়স্বজন ওকে রাস্তায় বের করে দিয়েছে। পথে-ঘাটে অনেক ঝড়-ঝাপটা সামাল দিতে গিয়ে বেচারা খচ্চর হয়ে গেছে। কেউ নেই ওর, আমার মতই গরীব, বিপদে-আপদে অনেক সাহায্য করেছে ও আমাকে। ওর কোনও উপকার করতে পারলে আমি সত্যিই খুশি হতাম।'

'বুঝলাম। কিন্তু আর যে জায়গা নেই, তুহীন। ওকে থাকতে দেব কোথায়?' অসহায় বোধ করছেন জুলিখালা। গরীব-দুখীর আদর্শ ত্রাণকর্ত্রী হিসেবে তার সম্পর্কে তুহীন যে বিরাট একটা ধারণা পোষণ করছে, সেই ভূমিকা থেকে নিচে নেমে যেতে ইচ্ছে করছে না তার, তাই সময় নিচ্ছেন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে।

'আমার বিছানায় শুতে পারে ও। আমি নাহয় গোলাঘরে ঘুমালাম। ঠাণ্ডা নেই যে কষ্ট হবে। তাছাড়া আমি তো আব্বার সঙ্গে যেখানে-সেখানে ঘুমাতাম,' আগ্রহের আতিশয্যে এক পা এগিয়ে এলো তুহীন।

ছেলেটার কথায় আর চেহারায় এমন কিছু দেখলেন জুলিখালা যে ওর কাঁধে একটা হাত রেখে নরম গলায় বললেন, 'তোমার বন্ধুকে নিয়ে এসো দেখি, তুহীন। তোমার বিছানা না দিয়েও হয়তো ওর জন্যে কোন ব্যবস্থা হতেও পারে। আগে দেখি ওকে।'

ছুটে বেরিয়ে গেল তুহীন। একটু পরেই ওর পিছু নিয়ে ঘরে ঢুকল দশ ঘাটের পানি খাওয়া বেপরোয়া চেহারার একটা ছেলে, চোদ্দ কি পনেরো বছর বয়স হবে। একনজরেই বোঝা যায় সহজ পাত্র নয়, 'খচ্চর' টাইটেলটা অর্জন করেছে সে টিকে থাকার সংগ্রামে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেই। ওকে দেখে মনে মনে বললেন জুলিখালা, 'বাপরে! নমুনা তো সুবিধের দেখছি না!'

'এই হচ্ছে সালাম, ঘোষণা দিল তুহীন।

'তুহীন বলছে, তুমি আমাদের এখানে আসতে চাও,' মিষ্টি ভঙ্গিতে শুরু করলেন জুলিখালা।

'হ,' উত্তর এলো সংক্ষিপ্ত। গলার স্বরটা কর্কশ।

'তোমার কোনও আত্মীয়-বন্ধু নেই যে তোমার দেখাশোনা করতে পারে?'

'না।' একই রকম কর্কশ উত্তর।

'বলো: না, জুলিখালা,' ফিসফিস করে বলল তুহীন।

'ওইসব কইতে পারুম না, চাপা গলায় উত্তর দিল সালাম।

'বয়স কত তোমার?'

'চোইদ্দ।'

'দেখলে আরও বেশি মনে হয়। কি পার তুমি?'

‘সবই পারি।’

‘সব মানে? চুরি, বাটপারি, পকেট মারা...’

‘পারি,’ নির্বিকার কণ্ঠে বলল সে।

‘এখানেও ওসব করবে নাকি?’

‘না।’

‘এখানে থাকতে হলে তোমার পড়ালেখা করতে হবে, খেলা ছাড়াও আর সবার মত আরও কিছু কাজ করতে হবে, নিয়ম মেনে চলতে হবে, প্রিন্সিপালের অবাধ্য হওয়া যাবে না। ভেবে দেখো, এভাবে চলতে পারবে?’

‘চেষ্টা কইরা দেখা যায়।’

‘বেশ, তুমি কদিন থাকতে পার। আমরা বুঝে দেখব তোমার সঙ্গে আমাদের আর-সবার পড়তা পড়ে কি না। ঠিক আছে, তুহীন, ওকে নিয়ে যাও এখন, সঙ্গ দাও; তোমার রহমান খালু ফিরে এলে আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত জানাব। আর একটা কথা, ওসব বাজে টাইটেল আমাদের এখানে চলবে না।’

এতক্ষণ ওর বড়-বড় দুই চোখ কঠোর, সমালোচকের বাঁকা দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল জুলিখালার মুখের দিকে, ঝট করে পিছনে ফিরল এবার, ‘আয়া পরো, তুহীন,’ বলেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

‘ধন্যবাদ, জুলিখালা,’ বলে বেরিয়ে গেল তুহীন। ঠিক বুঝতে পারছে না, ওর সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছিল, খচ্চর সালামের অভ্যর্থনা তার থেকে এত আলাদা কেন।

‘গোলাঘরে ছেলেরা সার্কাস করছে, তুমি যাবে দেখতে?’ সিঁড়ি দিয়ে প্রাঙ্গণে নামতে নামতে জিজ্ঞেস করল তুহীন।

‘বড়?’ জানতে চাইল সালাম।

‘না, বড়রা মাছ ধরতে গেছে।’

‘চলো তাইলে।’

গোয়ালঘরে নিয়ে গিয়ে সালামকে পরিচয় করিয়ে দিল তুহীন সবার সঙ্গে। খড় দিয়ে বড় একটা বৃত্ত তৈরি করা হয়েছে। তার ঠিক মাঝখানে একটা চাবুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে কাঞ্চন, আর একনম্বরের পিঠে চড়ে বৃত্তের বাইরে চক্কর দিচ্ছে দিলদার বেগ দিলু, বাঁদরের অভিনয় করে হাসাচ্ছে উপস্থিত দর্শকদেরকে।

‘শো দেখতে হলে জনপ্রতি একটা করে আলপিন দিতে হবে,’ বলল ভোটুকু। তিন চাকাওয়ালা ময়লা ফেলার গাড়ির পাশে দাড়িয়ে আছে সে, টিকেট কালেকটার। আর ময়লার গাড়ির ভিতর বসেছে দুই বাজনদার। ওস্তাদ সালাউদ্দীন আলী তার চিরুণি-সঙ্গীত বাজাচ্ছে কররাত কররাত শব্দে, আর একটা খেলনা ঢোলে ধুপুড়-ধাপ বেতালা বাড়ি মারছে সুজন ঢোলক।

‘ও তো নিমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ,’ বলল বাংলার পণ্ডিত তুহীন, ‘কাজেই ওর টিকিটের দামটা আমিই দিচ্ছি,’ বলে একটা বড়সড় ব্যাঙের ছাতার গায়ে দুটো বাঁকা পিন গেঁথে দিল-বর্তমানে ওটাই ক্যাশবাক্স। তারপর দুজন দুটো কাঠের তক্তার ওপর বসে পড়ল। দিলুর বাঁদরামি শেষ হতেই ময়লার গাড়ি থেকে নেমে জোড়া পায়ে লাফিয়ে একটা ভাঙা চেয়ার ডিঙিয়ে সালাউদ্দিন তাক লাগিয়ে দিল সবাইকে। তারপর তপন মিত্রের অনুকরণে নাবিকের মত দুলে-দুলে মই বেয়ে উঠে এবং নেমে হাসির রোল তুলল সবার মধ্যে। এবার মাইকেল জ্যাকসনের ভঙ্গিতে খানিকটা নেচে দেখাল কাঞ্চন, সেই সঙ্গে চিকন কাঁপা-কাঁপা গলায় গানও শুনিয়ে দিল আধখানা। তারপর ডাকা হলো তুহীনকে, কুস্তি করতে হবে বিশালদেহী অনেক খানের সঙ্গে। তিন মিনিটের মধ্যেই ভোটকুকে মাটিতে আছড়ে ফেলে ফিরে এলো তুহীন নিজের তক্তায়। এরপর রিঙে প্রবেশ করল দিলু দ্য গ্রেট, শূন্যে ডিগবাজী খেয়ে দেখাবে। গত কয়েকদিন দিনরাত প্র্যাকটিস করে শরীরের প্রতিটি গাঁট ব্যথা করে ফেলেছে ও। চমৎকার গোটা কয়েক ডিগবাজী দেখিয়ে সবার প্রশংসা অর্জন করল ও। কিন্তু রিং ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে দর্শকদের মধ্যে থেকে কথা বলে উঠল একজন।

‘দূর, এগিনি কোনও ডিগবাজী হইলো?’

‘সাহস থাকলে কথাটা আবার বলো শুনি!’ ফাইটার মোরগের মত ফুঁসে উঠল দিলু। জবর চোট লেগেছে ওর আত্মসম্মানে।

‘ক্যান? মারবা নিকি?’ তক্তা ছেড়ে উঠে আস্তীন গুটাতে শুরু করল স্ট্রীট ফাইটার খচ্চর সালাম।

‘সে কথা বলিনি আমি,’ বলেই দুই পা পিছিয়ে গেল দিলু। বুঝে নিয়েছে মারপিটের ফলাফল কি হবে।

‘এখানে মারামারির অনুমতি নেই,’ চেঁচিয়ে উঠল সবাই উত্তেজিত কণ্ঠে।

‘খালি দুদ-ভাত খাওন্তি, নাকি?’ তিক্তকণ্ঠে বলল সালাম। ‘আহা, অনুমতি নাই! মুরগীর কলিজা লইয়া আবার হুমকি দেও ক্যান?’ ভুরু নাচাল সে।

‘চলো!’ রাগে ফেটে পড়ল তুহীন। ‘এই যদি তোমার ব্যবহার হয়, এখানে তো থাকা হবে না তোমার, সালাম।’

‘না,’ ব্যাপারটা সামাল দিল দিলুই, ‘চলে যাওয়ার দরকার নেই। আমি শুধু বলতে চাই, আমারটা পছন্দ না হলে আমার চেয়ে ভাল করে দেখাক ও।’

‘তাইলে সইরা খারাও,’ বলে কোনও রকম প্রস্তুতি ছাড়াই লাফিয়ে শূন্যে উঠল খচ্চর, পরপর তিনটে ডিগবাজী দিয়ে নেমে এলো মাটিতে, দু’পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল পাথরের মূর্তির মত।

প্রশংসায় ফেটে পড়ল গোলাঘরটা। কিন্তু পরমুহূর্তে চুপ হয়ে গেল সবাই। আবার লাফিয়ে উঠেছে নবাগত ছেলেটা শূন্যে, এবার পিছন দিকে

তিনটে ডিগবাজী খেয়ে নামল মাটিতে; তারপর কাউকে দম ফেলার ফুরসত না দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মাটিতে, দেখা গেল মাথা নিচু পা উঁচু অবস্থায় দুই হাতে ভর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে ও খড় দিয়ে তৈরি রিঙের ভেতর। হৈ-হৈ করে উঠল সবাই, সবার চেয়ে জোরে চেচাচ্ছে দিলদার বেগ দিলু।

একলাফে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল ও ঘরের সবাইকে। যেন জানতে চায়, এখনও ওর শ্রেষ্ঠত্বে কারও কোনও সন্দেহ আছে কি না।

'দারুণ দেখিয়েছ! আচ্ছা, বেশি ব্যথা না পেয়ে এই কায়দা শেখার কোনও উপায় আছে?' জানতে চাইল মুগ্ধ দিলু।

'রাস্তা বাতলায়া দিলে কি দিবা?'

'আমার নতুন পাঁচ ফলার চাকুটা দেব। মাত্র একটা ফলা ভেঙেছে ওটার।'

'আগে দেও।' হাত বাড়াল সালাম।

মসৃণ হ্যান্ডেলটায় শেষবারের মত একটু হাত বুলিয়ে ওটা সালামের হাতে তুলে দিল ও। উল্টেপাল্টে পরীক্ষা করল সালাম, তারপর চাকুটা নিজের পকেটে রেখে একটা চোখ টিপে বলল, 'পেকটিস করতে থাকো, পাইরা যাইবা একসময়!' বলে বেরিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিল।

হাউ-মাউ করে উঠল দিলদার বেগ, বাকি সবাইও বাধা দিল ওকে

সবাই, এমন কি তুহীনও ওর বিরুদ্ধে, টের পেয়ে অনেক যুক্তি-তর্কের পর হাসিমুখেই ফেরত দিল ও দিলুর ছুরি। সাৎ করে ঢুকিয়ে রাখল দিলু ওটা ভেতরের একটা নিরাপদ পকেটে।

'এসো, তোমাকে জায়গাটা একটু ঘুরিয়ে দেখাই,' বলে সালামের হাত ধরল তুহীন। বুঝতে পারছে, ওর সঙ্গে এখুনি জরুরী কয়েকটা বিষয়ে আলাপ না করলেই নয়। নইলে একের পর এক গোলমাল পাকাবে সালাম এই ইসকুল বাড়িতে।

ওদের মধ্যে কি কথা হলো কেউ বলতে পারবে না, কিন্তু আবার যখন ফিরে এলো সালাম তখন ওর ব্যবহারে পরিবর্তন লক্ষ করল সবাই। যদিও কথাবার্তা রুক্ষ, কর্কশই রয়ে গেছে আগের মত।

ডিগবাজী খাওয়ায় সে যতই পারদশী হোক না কেন, ছেলেরা সবাই রীতিমত অপছন্দ করেছে নতুন ছেলেটাকে, ওরা এর সঙ্গে মিশবে না বলে স্থির করেছে। কিন্তু দিলু কখনও কিছু মনে রাখে না, তিনদিন যেতে না যেতেই প্রাণের বন্ধু হয়ে গেল ও সালামের।

স্ত্রীর মুখে সব শুনে এবং নিজে নতুন ছেলেটার সঙ্গে আলাপ করে তেমন একটা খুশি হতে পারেননি ডক্টর রহমান। মাথা নেড়ে বলেছেন, 'হ্যাঁ, চেষ্টা করে দেখা যায়; তবে মনে হচ্ছে লাভের চেয়ে ক্ষতিই হবে বেশি।'

এখানে আশ্রয় পেয়ে সামান্যতম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি সালাম।

সুযোগ-সুবিধা নিয়েছে, কিন্তু একটিবারের জন্যেও ধন্যবাদ জানায়নি কাউকে। ওর তীক্ষ্ণ দুই চোখ সারাক্ষণ সন্দেহের দৃষ্টিতে লক্ষ করছে সবাইকে, বিচার-বিশ্লেষণ করছে, কিন্তু যা দেখছে তা বিশ্বাস করতে বা মেনে নিতে পারছে না। বাস্তব জীবনে এতদিন ও যা দেখেছে, যা শিখেছে তার সঙ্গে এখানকার কিছুই যে মেলে না, তাই সন্দেহ।

ও যখন খেলে, দেহ-মনের সমস্ত জোর খাটিয়ে খেলে। দেখা যায়, প্রায় প্রতিটি খেলাতেই ও আর সবার চেয়ে ভাল করছে। কখনও রুদ্রমূর্তি, পরক্ষণেই বিমর্ষ, বিষন্ন, চুপচাপ। কেউ ওকে পছন্দ করতে পারে না, আবার ওর দুর্দান্ত সাহস, পৌরুষ আর প্রচণ্ড দৈহিক ও মানসিক শক্তির জন্যে প্রশংসা না করেও পারে না। ওর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে খলিল ভাইয়ের মত বড় একজনও একেবারে চিৎ হয়ে পড়ে গিয়েছিল মাঠে। সেই থেকে ওর ধারে কাছে ঘেঁষে না কেউ সহজে।

যখন পড়াশোনা করে, মন-প্রাণ ঢেলে দেয় ও। খুব দ্রুত শেখা হয়ে যায় সব পড়া। বোঝা যায় ধারাল একটা মগজ রয়েছে ওর মাথার ভিতর, কিন্তু ইচ্ছের বিরুদ্ধে ওকে পড়তে বসানো যায় না। ওর ওপর নজর রাখেন রহমান খালু, ওর মঙ্গলের জন্য সাধ্যমত সবকিছুই করেন; তবে মাঝে মাঝে বলেও ফেলেন, ‘একে মানুষ করা গেলে ভাল, কিন্তু এর দ্বারা বড় ধরনের কোনও ক্ষতি হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।’

ইতোমধ্যে বারকয়েক ধৈর্য হারিয়েছেন জুলিখালা, কিন্তু ওকে বের করে দেয়ার কথা ভাবেননি একবারও। তার দৃঢ় বিশ্বাস, ছেলেটার মধ্যে

কিছু না কিছু ভাল গুণ আছে। তিনি খেয়াল করেছেন, মানুষের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে কি হবে পশুপাখির প্রতি ওর মমতা আছে, বনে-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে ওদের আচরণ লক্ষ করতে ওর ভাল লাগে। আর সবচেয়ে বড় কথা, ওর সবটাই যদি খারাপ হবে তাহলে সুমনকে ভুলাল ও কি দিয়ে? কচি বাচ্চারা মানুষের মধ্যে ভালটা দেখতে পায় অতি সহজে। এমনি এমনিই আর 'আমাল থালামবাই' বলতে অজ্ঞান হতো না ও যদি ওর তরফ থেকে কোনও সাড়া না পেত। রোজ একবার করে থালাম ভাইয়ের পিঠে চড়ে ঘোরা চাই ওর। এতদিনে ছেলেটা একমাত্র সুমনের প্রতিই কিছুটা দুর্বলতা প্রকাশ করেছে, তাও নিজের অজান্তে, কেউ কাছেপিঠে নেই মনে করে। কিন্তু মায়ের চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি; বেশ কয়েকবারই কঠোর ছেলেটার চোখ থেকে সুমনের প্রতি গভীর স্নেহ ঝরতে দেখে ফেলেছেন জুলিখালা। এবং ভেবেছেন, না, এই ছেলেটিকে বানের জলে ভেসে যেতে দেয়া যাবে না।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক।

অন্যান্য ছেলেরা ওকে এড়িয়ে চলত বলে দিলদার আর কাঞ্চন প্রথম দিকে ওর সঙ্গে মিশত দয়া পরবশ হয়ে। কিন্তু অল্পদিনেই দয়াটা ভক্তিতে পরিণত হয়ে গেল। তিনজনের কাছে তিন কারণে আকর্ষণীয় হয়ে উঠল সে। তুহীন ওর প্রতি কৃতজ্ঞ দুঃসময়ে ওর সাহায্য-সহানুভূতি পেয়েছে বলে; দিলু মুগ্ধ ওর সাহস ও দক্ষতায়; আর কাঞ্চন ওকে পছন্দ করে ওর অফুরন্ত গল্পের ভাণ্ডারের জন্য। ওর কাছে সালাম হচ্ছে একটা

চলমান, জীবন্ত গল্পের বই—মন ভাল থাকলে ওর বিচিত্র অভিজ্ঞতার গল্প শোনায়। এই তিনজন ওকে পছন্দ করে টের পেয়ে সে-ও এদের কাছে ভাল থাকার চেষ্টা করে।

এদের মেলামেশা দেখে অবাক হয়েছিলেন, কিছুটা চিন্তায়ও পড়েছিলেন রহমান খালু। এদের প্রভাবে কিছুটা উপকার হবে সালামের সন্দেহ নেই, কিন্তু ওর প্রভাবে এদের আবার কোনও ক্ষতি হয় কিনা ভেবে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারেননি। তবে ভাল-মন্দ না বুঝে বাধা দেবেন না বলেই স্থির করেছেন।

সালাম জানে ওকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেন না খালু বা খালা কেউই। তাই নিজের ভাল দিকটা ও যত্নের সাথে আড়াল করে রাখে। আর ওঁদের ধৈর্যের ওপর চাপ সৃষ্টি করে একরকম বিকৃত আনন্দ পায়। যেন পরীক্ষা করে দেখতে চায় ওঁদের সহ্যক্ষমতা।

ইসকুল বাড়িতে মারপিট নিষিদ্ধ জানে বলেই গোলাঘরের পিছনে কয়েকজনকে বক্সিং শেখাবার নামে ও রাস্তার মারপিট শেখাচ্ছে। বড় ছেলেদের কেউ ওদিকে গেলে ছলে-বলে-কৌশলে তাকে মারামারিতে জড়াবার চেষ্টা করে। কেউ পিছিয়ে গেলে বিদ্রুপ করে। এইভাবে একদিন মেজাজি তপনকে চ্যালেঞ্জ করে জড়িয়ে ফেলল মারামারিতে।

আধঘণ্টা পর যখন দুজনেরই নাকমুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে, কোত্থেকে খবর পেয়ে ছুটে এলেন রহমান খালু। প্রথমে দুজনকে কলার ধরে টেনে

আলাদা করলেন, তারপর কঠোর গলায় বললেন, 'তোমরা জানো না ইসকুল বাড়িতে মারামারি করানিষেধ? এই স্কুল করেছি ছেলেদের মানুষ করার জন্যে, বুনো জানোয়ার বানাবার জন্যে নয়। মারামারিটা কে বাধিয়েছে?'

'সালাম,' একসঙ্গে জবাব দিল কয়েকজন।

'তোমার জানা নেই যে এখানে এসব নিষেধ?'

'আছে।' ভুরু কুঁচকে আরেক দিকে চেয়ে রইল সালাম।

'তাহলে নিয়ম ভাঙতে গেলে কেন?'

'মারামারি না জানলে এরা মায়ালোক হইয়া যাইব।'

'তপনকে কি তোমার মেয়েলোক মনে হলো? তাই যদি হয়, তাহলে মেরে তোমার নাকটা ফাটাল কে?' দুজনের মাথা কাছে এনে দিলেন তিনি, 'চেয়ে দেখো, কি করেছ তোমরা একজন আরেকজনের?'

সালামের একটা চোখ ছোট হয়ে গেছে, নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে, চোয়াল আর কপালে ছেঁচা খাওয়ার লালচে দাগ; আর তপনের ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছে, কপালে দেখা দিয়েছে একটা নীলচে আলু।

ভুরু কুঁচকে তপনের চেহারা পরীক্ষা করে প্রশংসা করল সালাম, 'হিগলে ভালা ফাইটার হইব।'

'কিভাবে আত্মরক্ষা করতে হবে সেটা ও শিখবে সময় হলে। কিন্তু

তার আগে তোমার বা আর কারও সাহায্যের কোনও দরকার পড়বে না। যাও, হাত-মুখ ধুয়ে নাও গিয়ে। আর সালাম, তুমি খেয়াল রেখো, আর একটা নিয়ম ভাঙলে বিদায় করে দেয়া হবে তোমাকে।'

গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ও কিছুক্ষণ, তারপর ধীরপায়ে চলে গেল বাড়ির দিকে।

কিন্তু অবাধ্যতা যার রক্তে মিশে গেছে সে কি করে সামলে রাখবে নিজেকে? কিছুদিন যেতে না যেতেই আরেক কাজ করে বসল। ও যেন সহ্যের সীমা পেরিয়ে গিয়ে দেখতে চায় কি হয়। যা হয় হোক, কোনও পরোয়া নেই।

সেদিন বৃহস্পতিবার বিকেলে মাঠে খেলতে খেলতে হঠাৎ দিলু বলল, 'চলো, নদীর ধার থেকে একগাদা কঞ্চি কেটে আনি গিয়ে; মাছ ধরা যাবে কাল।'

'হ্যাঁ,' বলল অনীক। 'একনম্বর গাধাটাকে সঙ্গে নিলে ও টেনে আনতে পারবে ছিপগুলো, আর চাইলে একজন ওর পিঠে চড়ে ফেরা যাবে?' হাঁটতে মোটেও ভাল লাগে না অনীকের।

'তুমি উইঠো না, মিয়া! তুমি ওইটার পিঠে উঠলে ঠাইট মারা যাইব বেচারা!' বলল সালাম। 'তার চাইতে অহন থেইকাই একটা হাতী পুষো, জামা কিনন লাগব না, তোমার পুরান শাট-প্যানগিনি পরাইতে পারবা।'

সবাই হাসতে হাসতে রওনা দিল নদীর দিকে। ফেরার পথে দিলু

উঠল একনম্বরের পিঠে, হাতে লম্বা একটা ছিপ। কাঞ্চন বলে উঠল, 'আরে! ঠিক ছবির বুলফাইটারের মত লাগছে তোমাকে, দিলু! শুধু লাল একটা কাপড় থাকলে পুরোটা মানিয়ে যেত।'

'কিন্তু বলদ পেতাম কোথায়?' ছিপটা বর্শার মত করে বাগিয়ে ধরে বলল দিলু।

'আছে,' বলল সালাম। 'বলদ না থাউক, গাই তো আছে। ওই দেহো, চরতাসে মাঠে। চলো, ওইটারে তাড়া করি!'

ইসকুল বাড়ির দুধেল গাই সোনালীকে দেখাল ও আঙুল তুলে।

'অ্যাই, খবরদার!' সাবধান করল কাঞ্চন। রহমান খালু...'

'আরে, রাখো তোমার খালু!' বলল সালাম। 'বুলফাইট করন মানা, ইমুন কথা তো কোনদিন হুনি নাই। না কি কইছে?'

'না, তা বলেনি, কিন্তু কাজটা করা ঠিক...'

'রাখো তো, মিয়া, খেলার মইদ্যে ডিসটাব কইরো না। তুমি আগে বাড়ো, দিলদার। এই লও লাল ফিল্যাগ!' নিজের লাল গেঞ্জিটা খুলে দিল সে দিলুকে।

দিলু ছুটল, ওপাশ থেকে ঢুকবে মাঠে; বাকি সবাই একটা করে কঞ্চি হাতে নিয়ে বেড়া টপকাল। এমন কি কাঞ্চনও মজা দেখবে বলে একটা খুঁটির ওপর উঠে বসল আরাম করে।

সোনালীর মেজাজ ঠিক নেই আজ। বাছুরটাকে আজ মাত্র একঘণ্টা কাছে পেয়েছে, জিভটা চুলবুল করছে ওকে চাটার জন্যে। এই মুহূর্তে গোটা মানব জাতিকে তার শত্রু মনে হচ্ছে। কাজেই যখন প্রখ্যাত ম্যাটাডর দিলদার বেগ বর্শার মাথায় লাল গেঞ্জি ঝুলিয়ে তার দিকে গাধা ছুটিয়ে এগিয়ে এলো, মাথা উঁচু করে ও শুধু 'বাঁ-আঁ-আঁ-' করে একটা ডাক ছাড়ল। ও ভাবতেও পারেনি ওর একনম্বর বন্ধুর পিঠে চড়া ওই লোকটা কঞ্চি দিয়ে চড়াৎ করে বাড়ি মারবে ওর পাছায়। গরু-গাধা দুজনেই চমকে গেল ঘটনার আকস্মিকতায়। বিচ্ছিরী গলায় ডেকে উঠল একনম্বর, আর রেগে গিয়ে শিং নিচু করল সোনালী।

'লাগাও আর এক বাড়ি?' চেঁচিয়ে উঠল খচ্চর সালাম।

তিন দিকে কঞ্চি হাতে দাঁড়িয়ে গেছে তিনজন সালাম, সালাউদ্দীন আর গাজী ফরিদ।

এভাবে ঘেরাও হয়ে, এবং আক্রমণকারীদের অসম্মানজনক আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে মাঠময় দৌড়াতে শুরু করল সোনালী, ক্রমে উত্তেজিত ও বিভ্রান্ত হয়ে উঠছে। যেদিকে যায় সেদিক থেকেই কঞ্চি দিয়ে বাড়ি মারা হচ্ছে ওকে। গজব নেমে এসেছে ওর ওপর, কিন্তু দারুণ মজা লুটছে ছেলেরা। বিশেষ করে কলজেয় চোট লেগেছে ওর পুরনো বন্ধু একনম্বরের ব্যবহারে। দিশেহারা হয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে হঠাৎ থেমে শিং তাক করল সে গাধাটার দিকে, তারপর ছুটল। গাধা বেচারা সরতে গিয়ে হোঁচট খেল, তারপর ঘোড়া, ম্যাটাডর সব একসাথে হুড়মুড় করে পড়ে

গেল খোলা জমিনে। থমকে গেল সোনালী, তারপর সবাইকে অবাক করে দিয়ে লাফিয়ে বেড়া ডিঙিয়ে টগবগিয়ে ছুটল রাস্তা ধরে।

‘ধরো, ধরো ওইটারে, থামাও! আউগাইয়া গিয়া থামাও!’ চেঁচাল সালাম, নিজেও ছুটল প্রাণপণে।

সালাম জানে, সোনালী হচ্ছে ডক্টর রহমানের সবচেয়ে প্রিয় গাই, ওটার কিছু একটা হয়ে গেলে ও নিজেও শেষ! অনেক দৌড়-ঝাঁপ, হাঁক-ডাকের পর পাওয়া গেল সোনালীকে-লম্বা দৌড়ের পর একটা ফুলের বাগানে লুকিয়ে বসে হাঁপাচ্ছে। কঞ্চিগুলো ঝোপের আড়ালে রাখা হলো। খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে একটা দড়ি জোগাড় করে সোনালীর মুখে পরিয়ে আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে চলল সালাম ওকে বাড়ির দিকে। পিছনে একদল ভীত-সন্ত্রস্ত, বিমর্ষ চেহারার ছেলে। সবাই বুঝতে পারছ কাজটা খুবই খারাপ হয়েছে। সোনালীর অবস্থা ভাল না। ভারী শরীর নিয়ে লাফিয়ে দেয়াল টপকাতে গিয়ে কাঁধে চোট পেয়েছে, ফলে হাঁটতে গিয়ে খোঁড়াচ্ছে এখন। একনম্বরের হালও সুবিধের নয়, সে-ও খোঁড়াচ্ছে। দুটোরই চোখ কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে, ঘামে ভিজে গেছে গা।

‘এবার আর রেহাই পাবে না, সালাম, একনম্বরের পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল দিলু।

‘তুমিও পাইবা না, তুমিও ছিলা আমার লগে।’

‘কাঞ্চন ছাড়া আমরা সবাই ছিলাম, বলল গাজী ফরিদ।

‘কিন্তু ও-ই চিন্তাটা ঢুকিয়েছে আমাদের মাথায়,’ বলল ওস্তাদ সালাউদ্দীন।

‘‘আমি তোমাদের অনেকবার বারণ করেছি!’ বলল কাঞ্চন। সোনালীর কষ্ট দেখে ওর বুকটা ফেটে যেতে চাইছে এখন।

‘মনে হইতাছে তোমাগো খালুসাবে এইবার আমারে লৌরাইয়া দিব। দিউগ্গা, কাউরে পরোয়া করি না আমি!’ বিড়বিড় করে বলল সালাম। বলছে বটে, কিন্তু মুখটা শুকিয়ে গেছে উদ্বেগে।

‘আমরা সবাই তোমার হয়ে অনুরোধ করব তাকে, কি বলো তোমরা?’ প্রস্তাব দিল কাঞ্চন। ভোটকু ছাড়া সবাই রাজি হয়ে গেল এক বাক্যে। ওর ধারণা একজনের ওপর সব শাস্তি বর্তালে বাকিরা খালাস পাবে বেকসুর।

‘আমার লেইগা ভাইবো না,’ মিনমিন করে বলল সালাম। ‘রাস্তার পোলা, ভাইসা যামু গা রাস্তা-ধোয়া পানিতে।’

সব শুনে আর সোনালীর করুণ অবস্থা দেখে কোনও কথা বললেন না রহমান খালু ঠোঁট টিপে মুখ বন্ধ করে রাখলেন, পাছে রাগের মাথায় বেশি কিছু বলে বসেন। গোয়াল ঘরে সোনালীকে আরাম করে শোয়ানোর ব্যবস্থা হলো, ছেলেদের পাঠিয়ে দেয়া হলো যার যার ঘরে-সন্ধের আগে কেউ ঘর থেকে বেরোতে পারবে না। বিচার হবে পরে।

এই সময়টুকুতে ওরা ভাবার সুযোগ পেল অন্যায়টা সম্পর্কে, আন্দাজ করার চেষ্টা করল কার কী শাস্তি হতে পারে, কল্পনা করার চেষ্টা করল সালাম না থাকলে কেমন লাগবে ওদের।

নিজের কামরায় জোরে জোরে শিস বাজাল সালাম কিছুক্ষণ, যাতে কেউ মনে না করে ও পরোয়া করে শাস্তির। কিন্তু অপেক্ষার সময় যত দীর্ঘ হচ্ছে ততই প্রবল হচ্ছে ওর থাকার ইচ্ছে। যতই মনে পড়ছে কি আরামে-আদরে ছিল ও এখানে, আর অন্যত্র কি পরিমাণ অনাদর ও কষ্টে কেটেছে ওর দিন, ততই দুর্বল হয়ে পড়ছে ওর বেপরোয়া ভাবটা। ও জানে, এঁরা সত্যিই নিঃস্বার্থ ভাবে ওকে সাহায্য করার চেষ্টা করছেন; সেজন্যে অন্তরের অন্তস্তলে আকাশ পরিমাণ কৃতজ্ঞতাও অনুভব করে; কিন্তু ওর কঠিন জীবন ওর মনটাকে কঠোর, সন্দেহপ্রবণ, স্বেচ্ছাচারী ও একগুঁয়ে করে দিয়েছে। যে-কোনও বাধাতেই বিদ্রোহ করা ওর স্বভাবে পরিণত হয়েছে, যে-কোনও নিষেধ ওর অমান্য করা চাই—নইলে নিজেকে পরাজিত, বন্দী বলে মনে হয়। যদিও জানে, বাধা বা নিষেধ ওর নিজেরই মঙ্গলের জন্যে।

যাক, এখন ভেবে আর কি লাভ! নিজেকে প্রস্তুত করল সে আবার আগের জীবনে ফিরে যাওয়ার জন্যে। এখানে ওখানে ঠোকর খেয়ে ফিরবে ও আজ এ-শহরে, কাল ও-শহরে। দুটো পয়সা রোজগারের ধান্ধায়, একমুঠো ভাতের জন্যে কী না করতে হয়েছে ওকে সারাটা জীবন! যত ভাবছে ততই কপাল কুঁচকে যাচ্ছে ওর, তারপর যখন ছোট্ট

কামরার চারদিকে আরাম ও নিশ্চয়তার নিশানা দেখতে পাচ্ছে, বুকের ভিতরটা হু-হু করে উঠছে। কিন্তু চেহারা থেকে এই সমস্ত ভাব দূর হয়ে গেল ওর সন্ধের পর ডক্টর রহমানকে কামরায় ঢুকতে দেখে।

'সব শুনলাম, সালাম,' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন ডক্টর রহমান, 'সব দেখলাম, মিসেস রহমানের সঙ্গে আলাপ করলাম। যদিও আবার তুমি নিয়ম ভঙ্গ করেছ, স্থির করেছি আর একটা সুযোগ দেব আমি তোমাকে, শুধু তোমার জুলিখালার খাতিরে।'

লাল হয়ে উঠল সালামের গোটা মুখ, মনে হলো কান দিয়ে গরম ভাপ বেরোচ্ছে। এভাবে আচমকা ছাড়া পেয়ে যাবে ও ভাবতেও পারেনি। কিন্তু তারপরেও কর্কশ ভঙ্গিতে তর্ক তুলল, 'বুলফাইটিং করা যাইব না, এই আইনের কথা কেউ তো আমারে কয় নাই?'

ছোকরার কৈফিয়ত শুনে না হেসে পারলেন না ডক্টর রহমান। তারপর আবার গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমি ভাবতেও পারিনি ইসকুল বাড়িতে কেউ এরকম অমানবিক কাজ করতে পারে, তাই এর বিরুদ্ধে নিয়ম করা হয়নি। কিন্তু আমাদের অল্প ক'টা আইনের একটা হচ্ছে: এখানে অবোলা প্রাণীর কারও প্রতি সামান্যতম নিষ্ঠুরতা করা যাবে না। আমরা সবাইকে এবং সবকিছুকে সুখী দেখতে চাই। আমাদের ভালবাসা, সহানুভূতি আর যত্ন পেয়ে যেন ওরাও আমাদের বিশ্বাস করতে পারে, ভালবাসতে পারে। আমার ধারণা ছিল অন্যান্য ছেলেদের চেয়ে পশু-পাখির জন্যে তোমার মায়া-মমতা অনেক বেশি, তোমার জুলিখালারও

একই ধারণা ছিল। এটা একটা মস্তবড় গুণ। কিন্তু আজ আমরা দুঃখ পেয়েছি, তুমি আমাদের হতাশ করেছ, সালাম। তোমাকে নিজেদের একজন ভাবতে পারছি না আর। তবু হাল ছাড়ছি না। আর একটাবার কি তুমি চেষ্টা করে দেখতে চাও?'

মেঝের দিকে চেয়ে বসেছিল সালাম, ডক্টর রহমানের নরম কণ্ঠে স্নেহের আভাস টের পেয়ে চট্ করে চোখ তুলে চাইল তাঁর মুখের দিকে, তারপর ওর পক্ষে যতটা সম্ভব ততটা ভদ্র গলায় জবাব দিল, 'হ, খালু!'

এই প্রথম তাকে খালু বলে ডাকল সালাম। খুশি হলেন ডক্টর রহমান। তিনি জানেন বেতের চেয়ে মায়া-মমতা অনেক কার্যকর। 'ঠিক আছে, এ-নিয়ে আর কোনও কথা নয়। শুধু আগামী কাল তোমরা কজন বাড়িতে থাকবে, সকালে আমাদের সবার সঙ্গে শহরে যেতে বা বিকেলে হাঁটতে যেতে পারবে না। সোনালী সেরে না ওঠা পর্যন্ত ওর যত্ন নিতে হবে তোমাদেরকে।'

'আইচ্ছা।'

'বেশ, এবার খেতে যাও নিচে। আর চেষ্টায় কোনও ত্রুটি রেখো না; আমাদের নয়, তোমার নিজেরই মঙ্গল হবে তাতে।' ওর কাঁধে দুটো চাপড় দিয়ে বেরিয়ে গেলেন রহমান খালু। ধীর পায়ে নিচে নেমে গেল সালাম। ভাবছে।

কয়েকটা দিন ভাল হয়ে চলল সালাম, বই নিয়ে আগের চেয়ে সময়

কাটাল দ্বিগুণ। কিন্তু একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ল ও, ফিরে গেল নিজের অভ্যস্ত, স্বেচ্ছাচারী জীবনে।

হঠাৎ জরুরী ডাক পেয়ে রহমান খালুকে একদিনের জন্যে দেশের বাড়িতে যেতে হলো। সেদিনটা ছুটি দেয়া হলো স্কুল। সারাটা দিনই বাইরে থেকে আসা ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলা করে কাটাল ওরা। সন্ধের দিকে এতই ক্লান্ত হয়ে পড়ল যে খেয়ে নিয়েই ছুটল বিছানার দিকে।

কিন্তু সেদিন দুষ্টামির প্ল্যান এঁটে রেখেছে সালাম। তুহীনকে একা পেয়ে খুলে বলল, বিছানার নিচ থেকে বের করে দেখাল একটা বোতল, একটা ইয়া বড় আর মোটা চুরুট আর এক প্যাকেট তাস। 'মজা করুম আমরা তিনজন আইজ রাতে। এক্কেরে বড়দের মথন, বুজলা? তুমি দিলদাররে ডাইকা আনো। রাইত ভর তাস খেলুম, মদ খামু আর টান দিমু চুরুটে।'

'কেউ পছন্দ করবে না ব্যাপারটা,' আপত্তি জানাল তুহীন।

'আরে, কেউ জানব কেমনে? রহমান খালু গেছেগা দেশে; সুমনের ঠাণ্ডা-জ্বর, খালায় তারে নিয়া ব্যস্ত; কে টের পাইব? আমরা তো আর হৈ-হাল্লা করুম না।'

'বাতি জ্বললে ফাতেমা আপা টের পেয়ে যাবে। খুব চালাক, সবসময় টের পায়।'

'পাইব না। কালি পড়া লণ্ঠনটা খুইজা আনছি। আলো ছড়াইব না।

আর কারও পায়ের আওয়াজ পাইলে একটা ফুক মারলেই আন্ধাইর।'

আইডিয়াটা পছন্দ হলো তুহীনের। চলল সে দিলুকে ডেকে আনতে। দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েও আবার মাথা ঢোকাল। 'কাঞ্চনকেও ডাকব?'

'নাহ্। অরে কইলেই না-না করব আর মৌলবিগো মথন ফতোয়া ঝাড়ব। খালি দিলুরে একটু ইশারা দিয়া আয়া পড়ো।'

এক মিনিটের মধ্যেই দিলুকে নিয়ে ফিরে এলো তুহীন, উস্কোখুস্কো চুল, ঘুমে চোখ বুঁজে আসছে, কিন্তু মজা হবে শুনে উঠে এসেছে বিছানা ছেড়ে।

'আগে পোকার খেলাটা শিখ্যা লও। দারুণ খেলা!' সবাই বসে পড়ল টেবিল ঘিরে। মদের বোতল আর মোটা চুরুটের পাশ থেকে তাসের প্যাকেটটা তুলে নিল সালাম। অল্প দু'চার কথায় বুঝিয়ে দিল পোকার খেলার নিয়ম, তারপর বলল, 'পয়লা এক ঢোক কইরা তাড়ি, তারপর একটান চুরোট, তারপর তাস-ঠিক বড়গো মথন। কি বুজলা?'

একটা গ্লাসে বোতল থেকে মদ ঢেলে এগিয়ে দিল সে দিলুর দিকে। একটা চুমুক দিয়েই নাক-মুখ কুঁচকে ফেলল দিলু; ভয়ানক বাজে গন্ধ আর ঝাঁঝাল স্বাদ। একই রকম বিচ্ছিরী লাগল ওটা তুহীনের কাছেও। আর চুরুটের ধোঁয়া তো আরও জঘন্য। কিন্তু বড়দের অনুকরণ করছে বলে কেউ কোনও আপত্তি তুলল না। তাছাড়া, বোঝা গেল সালামের কাছে এসব একেবারে ডালভাত। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর মুখ দিয়ে

জঘন্য সব গালাগাল বেরোতে শুরু করল। দিলু একবার বাধা দেয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু থামিয়ে দিল ওকে সালাম, 'তুমি চুপ থাকো, গাইল ছাড়া এইসব জমে না।'

অল্পক্ষণেই ঘুমে চোখ ভেঙে এলো দিলুর, তুহীনেরও মাথা ঘুরছে তিন-চার ঢোক তাড়ি খেয়ে; ফলে তাসে মন দিতে পারছে না ওরা। কাঁচে কালি লেগে আরও কমে এসেছে লণ্ঠনের আলো, জোরে হাসা যাচ্ছে না পাশের কামরায় ঘুমন্ত রুস্তম আলীর কানে যাবে বলে। তাই খেলাটা জমছে না কিছুতেই।

তাস বাঁটতে বাঁটতে হঠাৎ থেমে গিয়ে কান খাড়া করল সালাম, 'কেঠা জানি আইতাছে,' বলেই ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল বাতিটা। অন্ধকারে কে যেন বলে উঠল, 'দিলু গেল কই!' তারপর তার পায়ের শব্দ চলে গেল ফাতেমা আপার ঘরের দিকে।

'কাঞ্চন!' চাপা গলায় বলল সালাম। 'ডাকতে গেল ফাতেমা বুয়ারে। এক লৌরে বিছানায় গিয়া উঠো, দিলদার। কাউরে কিছু কইয়ো না!' বলেই জামা-টামা খুলে লাফিয়ে নিজের বিছানায় উঠল ও। তুহীনও শুয়ে পড়ল ঝটপট।

ছুটে গিয়ে বিছানায় উঠল দিলু। হাসছে কাঞ্চনকে বোকা বানাতে পেরে। হঠাৎ আঙুলে ছ্যাকা লাগতেই তাকিয়ে দেখল চুরুটটা এখনও ধরে আছে ও দুই আঙুলের ফাঁকে। প্রায় নিভে এসেছে চুরুট, ওটাকে

ভাল করে নিভাতে যাচ্ছিল ও, এমনি সময়ে ফাতেমা আপার গলা শোনা গেল। ওর হাতে চুরুট দেখলে সব ফাস হয়ে যাবে, তাই চট্ করে মেঝেতে ঠেসে ধরল ও আগুনের দিকটা, তারপর নিভে গেছে মনে করে ফেলে দিল ওটা খাটের নিচে।

ফাতেমা এসে দেখল নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে দিলু।

'আরে! একটু আগে তো ও ছিল না বিছানায়,' ওর গায়ে ধাক্কা দিল কাঞ্চন, 'অ্যাই, দিলু!'

'অ্যা...!' বলে অনেক কষ্টে চোখ মেলল দিলু।

'আবার কী দুষ্টামি ফন্দি বাইর করছ, দিলুমিয়া?' জিজ্ঞেস করল ফাতেমা আপা।

'কিছু না, তুহীনের ঘরে গেছিলাম একটু। যাও তো এখন, ঘুমাতে দাও!' বলেই পাশ ফিরল ও।

কাঞ্চনকে বিছানায় তুলে দিয়ে তুহীনের ঘরটা একটু দেখে গেল ফাতেমা আপা। দুজন বেঘোরে ঘুমাচ্ছে দেখে বুঝল এতরাতে জুলিখালাকে জাগানোর কোনও দরকার নেই। বেচারী এমনিতেই সুমনকে নিয়ে পেরেশান হয়ে আছে।

এদিকে কাঞ্চনকে নিজের চরকায় তেল দিতে বলে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল দিলু। বেচারা জানে না, কি চলছে এখন তার খাটের নিচে।

আসলে নেভেনি চুরুট। প্রথমে মেঝেতে বিছানো চাটাইয়ে ধরল

আগুন। তারপর ওখান থেকে ঝুলে থাকা বেডশীটে। তারপর তোশকে। তাড়ির নেশায় গভীর ঘুমে দিলু বিভোর, আগুনের ছ্যাঁকা না খাওয়া পর্যন্ত ভাঙলো না ওর ঘুম।

নিচে স্কুল ঘরে রাত জেগে পড়াশোনা করছিল খলিল ভাই। পড়া শেষ করে ঘর থেকে বেরিয়েই ধোঁয়ার গন্ধ পেল। দৌড়ে উঠে এলো ও দোতালায়, দেখল বোর্ডিং হাউজের বাম দিক থেকে গলগল করে বেরোচ্ছে কালো ধোঁয়া। কাউকে ডাকার আগে নিজেই দৌড়ে ঢুকল ও ঘরে, ছেলেদের টেনে নামাল জ্বলন্ত বিছানা থেকে, পানি দিয়ে নেভানোর চেষ্টা করল আগুন। কিছুটা কমল বটে, কিন্তু নিভল না আগুন। ছেলেরা আচমকা আগুন দেখে চেঁচাতে শুরু করল গলা ফাটিয়ে। এক মিনিটের মধ্যে এসে হাজির হলেন জুলিখালা। তার পরপরই ঢুকল রুস্তম আলী, হকচকিয়ে গিয়ে 'আগু---ন!' বলে এমন এক চিৎকার দিল যে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে বসল বাকি সবাই। সবাই হতভম্ব।

প্রথমে সামলে নিলেন জুলিখালাই। ফাতেমাকে বললেন পোড়া ছেলেদের দেখাশোনা করতে, খলিল আর রুস্তম আলীকে বললেন নিচ থেকে কাপড় ভিজিয়ে বালতি করে নিয়ে আসতে। এক নজর চারদিক দেখে নিয়ে প্রথমে বিছানা, তারপর কার্পেট এবং সবশেষে পর্দার আগুন নিভিয়ে ফেললেন ভেজা কাপড় চেপে ধরে।

বেশির ভাগ ছেলেই চেয়ে রইল হাঁ করে, কিন্তু তপন আর সালাম দৌড়ঝাঁপ করে পানি এনে দিয়ে, পর্দাগুলো টেনে নামিয়ে অনেক সাহায্য

করল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আয়ত্তে এসে গেল আগুন। আগুন নিভিয়ে সবাইকে শুয়ে পড়তে বলে রুস্তম আলীকে বসিয়ে রাখলেন জুলিখালা একটা টুলে-যদি আবার কোথাও আগুন দেখা দেয়, নেভাবে। এবার খলিলকে নিয়ে দেখতে গেলেন আহত ছেলেদের অবস্থা। কাঞ্চনের পুড়েছে সামান্য, কিন্তু ভয় পেয়েছে সাঙ্ঘাতিক; কিন্তু দিলুর মাথার অর্ধেক চুল গায়েব, তার ওপর অনেকটা জায়গা নিয়ে পুড়ে গেছে ডান হাত-ব্যথায় বাবারে-মারে বলে কোকাচ্ছে। কাঞ্চনকে নিজের কাছে নিয়ে গেল খলিল ভাই। দিলুর পরিচর্যায় সারা রাত জেগে বসে রইল ফাতেমা আপা। আর জুলিখালা একবার সুমনের কাছে আর একবার দিলুর কাছে ছোটাছুটি করলেন সারারাত।

পরদিন সকালে ফিরে এলেন রহমান খালু, ওঁকে দেখেই ঘিরে ধরল উত্তেজিত ছেলেরা, সবাই একসঙ্গে কথা বলছে, কারও কথা কিছু বোঝা যাচ্ছে না। শেষে হাত ধরে প্রায় টেনে নিয়ে গেল ওরা ওঁকে দোতলায় অগ্নিকাণ্ডটা দেখাতে। ওখানে দেখলেন, বিছানায় শুয়ে করুণ সুরে কাতরাচ্ছে দিলু, একনাগাড়ে আটদশটা করে হাঁচি মারছে সুমন, আর রাত জেগে একেবারে বিধ্বস্ত অবস্থা জুলিখালার।

অল্পক্ষণেই নিয়ম-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনলেন সদা-শান্ত রহমান খালু। আজকের জন্যেও ছুটি দেয়া হলো স্কুল, ক্ষয়ক্ষতি সারিয়ে ফেলা হলো বিকেলের মধ্যেই, আহতদের অবস্থা দেখা গেল ভালর দিকে। এইবার

বসলেন তিনি বিচারে। তুহীন আর দিলু অকপটে স্বীকার করল নিজ নিজ ভূমিকা, ওদের দুষ্টামির কারণে আরও কি ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়ে যেতে পারত বুঝতে পেরে দিলু তো কেঁদেই ফেলল। কিন্তু সালাম একটা বেপরোয়া ভঙ্গি নিল, এবং পরিষ্কার জানিয়ে দিল, এমন কিছু ক্ষতি হয়েছে বলে সে মনে করে না।

মদ, জুয়া, বিড়ি-সিগারেট ডক্টর রহমানের দুচোখের বিষ। আরও রাগ লাগছে ওঁর, যাকে বার বার সুযোগ দিয়েছেন, দোষত্রুটি ক্ষমা করেছেন, সে-ই ওঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে নিষ্পাপ ছেলেদের এইসব শিখিয়ে নষ্ট করার চেষ্টা করছে!

সবার সব কথা শোনার পর বিচারের রায় ঘোষণা করলেন ডক্টর রহমান শান্ত কণ্ঠে।

‘আমার মনে হয় যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে দিলুর। ওর হাতের ওই জ্বলুনি আগামী অনেকদিন ওকে মনে রাখতে সাহায্য করবে ওসব থেকে বিরত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। তুহীন সত্যিই দুঃখিত, আর ভয়ও পেয়েছে, আশা করা যায় ওসব বাজে জিনিসের ধারেকাছে যাবে না আর। তাছাড়া নিয়ম-কানুন মান্য করার সদিচ্ছা দেখেছি আমরা ওর মধ্যে। অথচ, সালাম, তোমাকে অনেকবার সাবধান করা হয়েছে, অনেকবার ক্ষমা করা হয়েছে, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। তোমাকে আর কারও ক্ষতি করার সুযোগ দেয়া যায় না, আমিও আর তোমার পেছনে অযথা বকবক করে সময় নষ্ট করতে চাই না। তুমি সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নাও, আর

ফাতেমাকে বলো আমার ছোট কালো ব্যাগটায় তোমার জিনিসপত্র ভরে দিতে।'

'কোথায় যাচ্ছে ও, খালু?' জিজ্ঞেস করল তুহীন।

'দূরের এক গ্রামে সুন্দর একটা খামার বাড়িতে; ওখানে ও কারও ক্ষতি করতে পারবে না, অথচ ওর নিজের উপকার হবে। এটাই ওর শেষ সুযোগ। রহিম সাহেব খুবই ভাল মানুষ। সালাম যদি ভাল হয়ে চলে ওখানে রীতিমত সুখেই থাকবে।'

'আর কোনদিন ফিরে আসবে না?' প্রশ্ন করল কাঞ্চন।

'সেটা নির্ভর করবে ওর আচরণের ওপর।' কথা শেষ করে ধীর পায়ে উঠে চলে গেলেন রহমান খালু রহিম সাহেবকে চিঠি লিখতে। সালামকে ঘিরে ধরল ছেলেরা, যেন চিরবিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে ও অজানা, দীর্ঘ, বন্ধুর পথে।

'ওখানে তোমার ভাল লাগবে কি না কে জানে,' বলল ফরিদ।

'না লাগলে থাকুম না,' বেপরোয়া ভঙ্গিতে বলল সালাম।

'কোথায় যাবে?' এবার প্রশ্ন তুহীনের।

'যেদিকে দুই চোখ যায়,' উদাস কণ্ঠে জবাব দিল সালাম। 'উত্তর-দক্ষিণ-পুব-পচ্চিম একদিকে গেলেই হয়, জায়গার কি অভাব আছে দুনিয়ায়? হয়তো ইন্ডিয়ায় যমুগা, আর আহুম না।'

‘না-না! রহিম সাহেবের কাছে কিছুদিন থেকে ফিরে এসো এখানে, প্লিজ!’ মিনতি করল তুহীন।

‘কোথায় যামু, কতদিন থাকুম-আমার ইচ্ছা! তবে এইটা জাইনা রাইখো, এইখানে আর ফিরতাছি না!’ এই বলে নিজের (ডক্টর রহমানের কাছ থেকে পাওয়া) জিনিসপত্র গুছাতে চলে গেল সালাম। তুহীন গেল ওর সঙ্গে, বাকিরা চলে গেল গোলাঘরে বিষয়টা নিয়ে বিশদ আলোচনা করবে বলে।

দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে জুলিখালার এক্কাগাড়িটা, ব্যাগ হাতে নেমে এলো সালাম, নিচুগলায় তুহীনকে বলল যেন ছেলেদেরকে না ডাকে। জুলিখালা নেমে এলেন ওকে বিদায় জানাতে। চেহারাটা ওঁর এমন দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে রয়েছে যে খচ্ করে বুকের ভিতর একটা খোঁচা খেল অবাধ্য ছেলেটা। যতই বেয়াড়া হোক, মমতা চিনতে ভুল হয় না কারও। মাথা নিচু করে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করল ও জুলিখালাকে, মৃদু গলায় বলল, ‘সুমন কানব আমারে না দেখলে,’ কথাটা বলেই, চট্ করে অন্যদিকে তাকাল নিজের চোখের পানি গোপন করতে।

সামলে নিয়ে রহমান খালুর পাশে উঠে বসল সালাম। চেয়ে দেখল, ওর একান্ত ভক্ত তুহীন আর একান্ত শ্রদ্ধেয়া জুলিখালার চোখে টলমল করছে পানি।

কয়েকদিন পর চিঠি এলো রহিম সাহেবের, ভাল আছে সালাম, মন

দিয়ে কাজ শিখছে। খুশি হলেন রহমান খালু কিন্তু দুই মাস পর আরেক চিঠিতে জানা গেল, খামার থেকে পালিয়ে গেছে সালাম, কোনও খোঁজ নেই ওর। গম্ভীর হয়ে গেলেন রহমান খালু, বললেন, 'ওকে এখানেই আর একটা সুযোগ দেয়া বোধহয় উচিত ছিল, জুলি।'

'চিন্তা কোরো না,' সান্ত্বনা দিলেন জুলিখালা! 'তুমিই না বলেছিলে ওকে ফিরে আসতেই হবে। আমি বিশ্বাস করি কথাটা। ওর ভালর জন্যে যেটুকু চেষ্টা আমরা করেছি, সেটা বিফল্লে যাবে না। আমার অন্তর বলছে ও ঠিক ফিরে আসবে।'

কিন্তু দিনের পর দিন কাটতে থাকল, এলো না সালাম।

ছয়

গরম পড়েছে খুব। বড় ছেলেরা সন্ধের পরও বাইরে, ছোটরা উঠে পড়েছে যার যার বিছানায়। সুমনের জামা খুলতে খুলতে থমকে গেলেন জুলিখালা।

‘ওইত্তো আমাল থালামবাই!’ হঠাৎ বলে উঠেছে সুমন।

‘কোথায়!’

আঙুল তুলে দেখাল ও জানালার দিকে, ‘ওই চানমামার পাশে আমাল থালামবাই।’

‘না, আববু, কিছুই নেই ওখানে।’ বললেন বটে, কিন্তু কি জানি, যদি সত্যিই দেখে থাকে, ভেবে একছুটে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে ইসকুল বাড়ি। ঝিরঝিরে দখিনা বাতাস আসছে জানালা দিয়ে। কোথাও কিছু চোখে পড়ল না। সুমনকে ওর খাটিয়ায় তুলে দিয়ে দরজা খুলে সালামের নাম ধরে বারকয়েক ডাকাডাকি করলেন জুলিখালা, কোনও জবাব না পেয়ে বুঝলেন, না, কিছু না, দৃষ্টিবিভ্রম।

আরও কয়েক বার থালামবাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করে ঘুমিয়ে পড়ল সুমন। নদীর ধার থেকে ফিরে এলো বড় ছেলেরা। ওরা ঘুমিয়ে পড়তেই নিঝুম হয়ে গেল ইসকুল বাড়ি। কেবল কয়েকটা ঝিঁঝি ডেকে চলেছে পাল্লা দিয়ে। সেলাই নিয়ে বসলেন জুলিখালা, সুমনের মনের ভুলটা সত্যি

হলে ভাল হতো, ভাবলেন একবার। স্বামীকে জানাবার দরকার বোধ করলেন না। বেচারা সারাটা দিন পরিশ্রমের পর এখন আবার দরকারী চিঠি লিখতে বসেছেন।

দশটার দিকে উঠলেন তিনি সেলাই রেখে, দরজাগুলো বন্ধ করে শুতে যাবেন। বাইরের সিঁড়ির ধাপে দাড়িয়ে মুগ্ধদৃষ্টিতে চাইলেন চারপাশে-প্রশান্তিতে ভরে গেল মনটা, কি অপরূপ সুন্দর লাগছে আজ সবকিছু। আঙিনার একপাশে সাদামত কি যেন চোখে পড়ল। বিকেলে ছোটরা ওখানে খড়ের গাদার পাশে খেলছিল, নিশ্চয়ই কেউ কিছু ফেলে এসেছে ভেবে এগিয়ে গেলেন জুলিখালা। কয়েক পা গিয়েই টের পেলেন ওটা কারও রুমাল বা টুপি নয়, জামার আস্তীন, তার ভেতর থেকে একটা হাত বেরিয়ে আছে বাইরে। ঘুরে গাদার ওপাশে গিয়েই দেখতে পেলেন শুয়ে আছে সালাম, ঘুমে বিভোর।

শুকিয়ে হাড় বেরিয়ে এসেছে চোয়ালের, পায়ে জুতো নেই, লাল গেঞ্জিটা খুলে একপায়ে বাঁধা, বোধহয় কোনও জখমের ক্ষত ব্যান্ডেজ করেছে অপটু হাতে।

এখানে তো ওকে ফেলে রাখা যায় না, ভাবলেন জুলিখালা। নিচু হয়ে ডাকলেন নাম ধরে। ঘুমের ঘোরে চোখ মেলল সালাম, মিষ্টি হাসি ফুটল ঠোঁটে, অস্ফুট কণ্ঠে বলল, খালাম্মা, আমি বাড়ি ফিরা আইছি।

কথাগুলো জুলিখালার হৃদয় স্পর্শ করল। ওর মাথার নিচে হাত

দিয়ে ওকে তোলার চেষ্টা করলেন। বললেন, 'আমি জানতাম তুমি আসবে, সালাম। ফিরে এসেছ বলে আমি খুব খুশি হয়েছি, বাপ। হঠাৎ পুরোপুরি জেগে উঠল ছেলেটা, কোথায় আছে বুঝে উঠতে সময় নিল একটু। কিন্তু এইমাত্র বলা কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারছে না। আগের মতই কর্কশ হয়ে উঠল ওর ব্যবহার।

'এই পথেই যাইতেছিলাম। ভাবলাম সুমনরে একনজর দেইখা যাই।'

'সোজা চলে এলে না কেন ভেতরে? সুমন সত্যিই তাহলে তোমাকে দেখেছিল! খানিক আগে আমি যে তোমার নাম ধরে ডাকাডাকি করলাম, শোনোনি তুমি?'

'আপনেরা ঢুকতে দিবেন মনে করি নাই,' বলে ছোট একটা পুঁটলি নিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল, যেন এখনই নিজের পথে রওনা হয়ে যাবে।

'এসো, দেখো ঢুকতে দিই কিনা!' বললেন জুলিখালা।

কাপা একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ওর বুকের ভিতর থেকে! মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, যেন বিরাট একটা বোঝা নেমে গেছে ওর মাথা থেকে। একটা মোটা লাঠি তুলে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে দরজার দিকে এগোলো কয়েক পা, তারপর থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'খালু রাগ করবো, রহিম সাবের খামার থেইকা আমি পলাইছি হুনলে...'

'উনি জানেন, জেনে দুঃখও পেয়েছেন; তবে তোমাকে ফিরে পেলে

দুঃখটা থাকবে না। তোমার পায়ে কি হয়েছে, খোঁড়াচ্ছ কেন?'

'উচা দেওয়াল টপকাইতে গিয়া একটা পাথর পইরা গুরা হোয়া গেছে হাডিড। ইমুন কিছু না।' দাঁতে দাঁত চেপে প্রতিবার পা ফেলার সময় তীব্র ব্যথা সহ্য করছে ছেলেটি।

ওকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন জুলিখালা। একবাটি দুধ আর সেইসঙ্গে কিছু খাবার এনে দিয়ে বললেন, 'আগে এগুলো খেয়ে নাও দেখি, তারপর তোমার পা'টা দেখব। আর কোন চিন্তা নেই, বাড়ি চলে এসেছ যখন, ভাল হয়ে উঠবে এবার।'

কৃতজ্ঞচিত্তে দুধের বাটি খালি করল সালাম, তারপর খেয়ে নিল খাবারগুলো। প্রতিটি গ্রাস মুখে দেয়ার সাথে সাথে যেন ওর ভিতর ধাপে ধাপে প্রাণশক্তি ফিরে এলো।

আলমারি থেকে গোল করে প্যাঁচানো ব্যান্ডেজ বের করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন জুলিখালা, 'এতদিন ছিলে কোথায় বলো তো?'

'রশিদ সাব মানুষ ভালা, কিন্তু খুব কররা। মন বইল না, এক লোকের লগে নৌকায় উইঠা কয়েক মাইল ভাটিতে আইসা নামলাম এক গঞ্জে। এক গেরস্তো বাড়িতে কাম করলাম বিশ-পঁচিশ দিন। ওর ব্যাদ্দব পোলাটারে ধইরা একদিন মাইর দিলাম, আর বুইরাও আমারে মাইর দিয়া খ্যাদায়া দিল। আবার হাঁটতে থাকলাম।'

'হেঁটেই চলে এলে এতদূর? আর খাওয়া-দাওয়া, ঘুমানো?'

‘হ, পায়ে চোট লাগার আগে পর্যন্ত জোর কদমেই হাটছি, খাইছি এর খ্যাতের শশা-তরমুজ আর ওর খ্যাতের বাঙ্গি। ঘুমাইছি মাইনষের গোলাঘরে। শটকাট করতে গিয়া রাস্তা হারাইয়া উল্টাপাল্টা ঘুরছি কিছুদিন, নাইলে আরও আগেই আইয়া পরতাম এইখানে।’

‘এইখানেই আসছিলে তাহলে?’

‘হ, মনে করছিলাম সুমন আর আপনেরে দেইখা যামুগা শহরে। কিন্তু শরীলটা ভাইঙ্গা আইল বইলা ঘুমায়া পড়ছিলাম। আপনে খুঁইজা বাইর না করলে কাইল বিয়ানে রওনা হইয়া যাইতাম, শহরে গিয়া...’

‘আমি খুঁজে বের করায় কি তুমি খুশি হওনি, সালাম?’

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিচু গলায় বলল ও, ‘হইছি, খালাম্মা। আমি এইখানেই থাকতে চাই, কিন্তু ডরাইছি আপনেরা...’

‘হায়, হায়!’ পায়ের অবস্থা দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন জুলিখালা। ‘কবে পাথর পড়েছিল?’

‘তিন-চারদিন আগে।’

‘এই পা নিয়ে তিন-চারদিন ধরে হাঁটছ!’

‘লাঠিতে ভর দিছি বেশি।’

‘ইশশ! এখুনি তোমার রহমান খালুকে ডাকতে হবে ব্যান্ডেজ করার জন্যে!’ বলেই পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন জুলিখালা। দরজা খোলা থাকায়

প্রতিটি কথা শুনতে পেল সালাম।

‘শুনছ? ছেলেটা ফিরে এসেছে।’

‘কে? সালাম?’

‘হ্যাঁ,’ বলে আদ্যোপান্ত সব বললেন তিনি এক নিঃশ্বাসে। তারপর বললেন, ‘আমার ঘরে অপেক্ষা করছে ও, তুমি যদি ক্ষমা করে আবার ওকে নাও, ও থাকতে চায়।’

‘ক্ষমা চেয়েছে ও?’

‘মুখে বলেনি, কিন্তু ওর চোখে-মুখে করুণ আকুতি দেখেছি আমি। ঘুমের ঘোরে খালাম্মা বলে ডেকে উঠেছে আমাকে, বলেছে খালাম্মা, আমি বাড়ি ফিরে এসেছি। তুমি কি বলো, রহমান? ওকে থাকতে দেবে?’

‘নিশ্চয়ই দেবো!’ বললেন মহৎ হৃদয় প্রফেসর; ‘পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আমাদের সদিচ্ছা ওর অন্তর ছুঁয়েছে। ব্যস, আর তো কিছুর দরকার নেই, জুলি। সুজনকে যেমন পারব না, এখন ওকেও আর তাড়িয়ে দিতে পারব না আমি কোনদিন।’

কান পেতে ছিল সালাম। টেরও পেল না কখন মস্ত দুই ফোঁটা পানি জমল চোখে, কখন নেমে গেল ওর ধুলোমাখা গাল বেয়ে। যখন হুশ হলো, চট্ করে মুছে ফেলল ও পানিটুকু। কিন্তু ততক্ষণে নিঃস্বার্থ ভালমানুষদের প্রতি ওর যে সন্দেহ আর অবিশ্বাস, সেটা দূর হয়ে গেছে চিরতরে ও এখন জানে, সত্যিই দুনিয়ায় ভাল মানুষ আছে। ওর মনে

হলো, যেমন করে হোক এর প্রতিদান দিতে হবে, প্রমাণ করতে হবে এত বড়, এত মহৎ মানুষদের ভালবাসা পাওয়ার যোগ্যতা ওর আছে।

‘ওর পাটা একটু দেখবে, চলো,’ বললেন জুলিখালা। ‘তিনটে দিন অনেক কষ্ট করেছে বেচারা। আমি তোমাকে কথা দিতে পারি, এই দুর্দান্ত সাহসী ছেলেটা সত্যিই একদিন মানুষের মত মানুষ হবে।’

‘ঠিক আছে, আজ পর্যন্ত তোমার কোন কথার অবাধ্য হয়েছি আমি বলো?’ ঠাট্টা করলেন ডক্টর রহমান। ‘চলো, দেখা যাক, কি অবস্থা ওর পায়েব। কোথায় ও?’

‘আমার ঘরে। কিন্তু ওকে বকা দিতে পারবে না, প্লিজ! ধৈর্য আর সহিষ্ণুতা দিয়ে জয় করতে হবে ওকে, ঠিক যেভাবে আমাকে জয় করেছিলে।’

‘তুমি ওর মত দুষ্টু ছিলে বুঝি?’ হেসে উঠলেন ডক্টর রহমান।

‘কমও কিছু ছিলাম না। যাই হোক, আমার বিশ্বাস অত্যন্ত ভাল একজন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারব আমরা ওকে একটু যত্ন নিলেই।’

‘তোমার ওপর আল্লার রহম বর্ষিত হোক!’

চেয়ার ঠেলে উঠে পড়ার শব্দ হলো। ওঁরা দুজন এঘরে এসে দেখলেন টেবিলের ওপর ভাঁজ করা হাত রেখে তার ওপর মাথা দিয়ে মনে হচ্ছে ঘুমিয়ে পড়েছে ছেলেটা। কিন্তু ওঁরা কাছে আসতেই চট্ করে

মাথা তুলল। উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, কিন্তু কাঁধের ওপর রহমান খালুর বিশাল থাবা পড়ল। খুশি খুশি গলায় বললেন তিনি, 'দেখা যাচ্ছে, রশিদ সাহেবের খামার বাড়ির চেয়ে এই ইসকুল বাড়ি তোমার বেশি পছন্দ। ঠিক আছে, আবার একবার চেষ্টা করে দেখি আমরা, কি বলো?'

'ধইন্যবাদ, স্যার,' বলল সালাম।

'এবার পাটা দেখি...এহ-হে! অবস্থা তো দেখছি সুবিধের না! কাল সকালেই ডাক্তার সাহেবকে খবর দিতে হবে। একটু গরম পানি, জুলি, আর কিছুটা নরম কাপড়।'

সালামের ফোলা পা গরম পানিতে ধুয়ে বেঁধে দিলেন ডক্টর রহমান। এরই ফাঁকে গেস্টরুমে রাখা এ-বাড়ির একমাত্র খালি খাটে বিছানা করে ফেললেন জুলিখালা। ছেলেরা কেউ বেশি অসুস্থ হলে এইখানে রাখা হয়, যাতে বার বার তাকে ওপর-নিচ করতে না হয়। বিছানা তৈরি হয়ে গেলে ছেলেটাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিলেন রহমান খালু, শুইয়ে দিয়ে একটু মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেলেন নিজের কাজে।

কয়েক ঘণ্টা মড়ার মত ঘুমাল সালাম, তারপর জেগে গেল পায়ের টিশটিশে ব্যথায়। মনে হলো ক্রমেই বাড়ছে ব্যথা। দাঁতে দাঁত চেপে রাখল ও, যাতে ওর গোঙানি শুনে কারও ঘুমের ব্যাঘাত না হয়। কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যেই টের পেয়ে গেলেন জুলিখালা।

ঘুম পাতলা ওঁর। রাতে ঠাণ্ডা পড়লে উঠে জানালা বন্ধ করে দেয়া,

সুজন-সুমন বা আর কারও মশারি সরে গেলে আবার গুঁজে দেয়া, দিলু আবার ঘুমন্ত অবস্থায় হেঁটে বেড়াচ্ছে কিনা দেখা— এসব ওঁর অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। সালামের অস্ফুট 'উহ্, আহ্' ঠিকই কানে গেল ওঁর।

'ব্যথা লাগছে?'

'হ। কিন্তু আপনেরে ঘুম থেইকা জাগাইতে চাই নাই আমি,' বলল সালাম।

'আমার কথা ছাড়ো, সারারাতই প্রায় জেগে থাকি বাদুড়ের মত। ইশ্, পা থেকে যেন আগুন বেরোচ্ছে! ব্যান্ডেজটা ভেজানো দরকার,' বলে আরও কিছু কাপড় আর একটা বড় মগে বরফ দেয়া পানি নিয়ে এলেন।

খুব দ্রুত কমে গেল ব্যথা! ঘুমিয়ে পড়ল সালাম। ভোরের দিকে আবার একবার ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ব্যান্ডেজ ভিজিয়ে দিলেন জুলিখালা, কিন্তু এত গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিল ছেলেটা যে টেরই পেল না। কিন্তু খালা টের পেলেন, ওর ব্যথায় কুঁচকানো ঘুমন্ত মুখ থেকে ভাজগুলো দূর হয়ে গেল।

পরদিন শুক্রবার, তাই ইসকুল বাড়ি চুপচাপ। দুপুর পর্যন্ত একটানা ঘুমিয়ে তারপর জাগল সালাম। এদিক ওদিক চাইতেই দেখল দরজার ফাঁকে ছোট্ট একটা মুখ হাঁ করে দেখছে ওকে। ওর দিকে দু'হাত বাড়াতেই চেঁচিয়ে উঠল সুমন, 'এইত্তো আমাল থালামবাই!' তিড়িংবিড়িং লাফাচ্ছে আর গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে, 'থালামবাই এথেতে, থালামবাই

এথেতে!' তারপর দৌড়ে এসে ডাইভ দিয়ে পড়ল বিছানায়। ছটফট করছে খুশিতে।

নাস্তা নিয়ে ঢুকলেন জুলিখালা।

ওটা শেষ হতেই ঢুকলেন ডাক্তার। পায়ের কয়েকটা ভাঙা হাড় জায়গামত সেট করতে প্রায় ঘন্টাখানেক লেগে গেল। আর এই একটা ঘণ্টা দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে রইল সালাম, দরদর করে ঘামল, কিন্তু টুঁ-শব্দটি বের করল না মুখ থেকে।

কাজ শেষ করে সালামের প্রশংসা করলেন ডাক্তার, তারপর জুলিখালাকে সাবধান করলেন, 'আগামী সাতদিন মাটিতে যেন পা না পড়ে, পুরো বেডরেস্ট। সাতদিন পর পরীক্ষা করে দেখে আমি বলব, ক্রাচে ভর দিয়ে এক-আধটু নড়াচড়া করা যাবে কি যাবে না।' জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে চলে গেলেন ডাক্তার।

ক্রাচের কথা শুনে মন খারাপ হয়ে গেছে সালামের। ওর ধারণা চিরতরে পঙ্গু হয়ে গেল বুঝি। অবস্থা দেখে জুলিখালা ঠিক করলেন ওর বন্ধুদেরকে গল্প করার জন্যে ডাকবেন। কাকে ডাকলে ওর ভাল লাগবে জিজ্ঞেস করায় জবাব পাওয়া গেল, তুহীন আর কাঞ্চন। হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'আইচ্ছা, হাবিজাবি ভরা আমার ছোট ব্যাগটা কি ফালায়া দিছেন?'

'না তো,' হাসলেন জুলিখালা। 'ভেতরে একনজর চেয়েই বুঝতে

পেরেছি তোমার মূল্যবান সম্পত্তি আছে ওতে।' হাসতে হাসতেই ব্যাগটা এনে দিলেন ওর হাতে।

একটা রুমালে পিন দিয়ে আটকানো রয়ছে কয়েকটা বিরল প্রজাতির পোকা, ফড়িং আর প্রজাপতি। আরেকটা পুটলিতে হরেক রকম সংগ্রহ পাখির ডিম, শামুকের খোল, বিচিত্র আকৃতির পাথর আর গোটাকয়েক ছোট আকারের, জ্যান্ত, প্রতিবাদী কাকড়া-বন্দী করায় অসম্ভব রেগে গিয়ে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে দাড়া উঁচিয়ে রেখেছে।

'এগিনি রাখার একটা জায়গা পাওয়া যাইব?' জানতে চাইল ও। 'জগদীশ বাবুর লগে গিয়া খুঁইজা আনছিলাম। জাতিলা কাকরা।' বলতে বলতে পায়ের ব্যথা ভুলে হেসে উঠল একটা কাঁকড়াকে বিছানার উপর দিয়ে সড়সড় করে বিচিত্র ভঙ্গিতে পাশে হাঁটতে দেখে।

'একটা পাখির খাঁচা আছে সরু জালের। আনছি আমি। তুমি সাবধান থেকো, ওদের একটা চিমটি খেলে কিন্তু চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলবে সুমন সাহেব।'

তুহীন, কাঞ্চন আর খাঁচা একই সাথে এলো। খাঁচার ভিতর এতই সাবলীল ভঙ্গিতে ওপর-নিচ যেদিক খুশি হেঁটে বেড়াতে থাকল কাকড়াগুলো যে খুবই মজা পেল তুহীন ও কাঞ্চন।

বন্ধুদের পেয়ে গল্পে মেতে গেল সালাম। ওদেরকে খোলামেলা গল্পের সুযোগ দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন জুলিখালা। এখান থেকে যাওয়ার

পর কোথায়, কবে, কি ঘটল বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছে ও বন্ধুদের। মাঝে থেমে ওর সংগ্রহ সম্পর্কেও বলছে। অবাক হয়ে গেলেন জুলিখালা এসব বিষয়ে ওর জ্ঞানের বহর দেখে। মজাও লাগছে শুনতে, তাই খোলা রাখলেন একটা কান। ভাবছেন, তুহীন যদি মস্ত বড় বেহালাবাদক, আর সালাম যদি নামজাদা এক প্রাণীতত্ত্ববিদ হতে পারে-কী ভালই না লাগবে তাঁর!

স্রেফ গিলছে ওরা প্রজাপতি আর গুবরে পোকার জীবনবৃত্তান্ত, ভোঁদড়ের বাসা তৈরির কৌশল, এতই মগ্ন হয়ে গেছে যে কোনদিকে খেয়াল নেই। রহমান খালু নিজে এসে ডাক দিতে হুঁশ হলো-হাঁটতে যাওয়ার সময় হয়েছে। ওরা ছুটে বেরিয়ে যেতে মন খারাপ হয়ে গেল সালামের। টের পেয়ে ওকে কোলে তুলে জুলিখালার বৈঠকখানায় এনে সোফায় বসিয়ে দিয়ে গেলেন খালু।

সুজন আর সুমনকে ছবির বই থেকে গল্প শোনাচ্ছিলেন ওখানে জুলিখালা, এক ফাঁকে সালামকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এইসব কীটপতঙ্গ সম্পর্কে এত কিছু জানলে কি করে?'

'বহুত আগে থেইকাই এইসব টানে আমারে,' বলল সালাম, 'কিন্তু জগদীশ বাবুর কাছে শিখছি যা কপচাই।'

'জগদীশ বাবুটা কে?'

'ঢাকায় কোথায় জানি পড়ায়। ছুটি পাইলে গ্রামের বাড়িত গিয়া

এইগিনি দেখে। থাকে রহিম সাবের বাড়ির কাছেই। লেখাপড়া জানা মানুষ। মাছ, ব্যাঙ, পোকা-মাকড়ের কথা লেইখা ডাক্তারি পাশ করছে। আমারে ডাকত, আমিও যাইতাম। গল্পে গল্পে শিখাইয়া দিত বহুত কিছু। আরও কিছুদিন থাকতে পারলে অনেক শিখতে পারতাম।'

'কার কথা বলছ তুমি! ঢাকা ইউনিভার্সিটির ডক্টর জগদীশ ভট্টাচার্য?'

'হইতে পারে, ঠিক জানি না। রহিম সাব কইত আস্তা পাগল। মোটাগাটা লোকটা। হিন্দু মানুষ, কিন্তু ঘিনপিত নাই। খুব আদর করত আমারে। পাখিরে ডাইকা হাতে বসাইতে পারত; কাঠবিলাই, খরগোশ তো তারে মানুষই জ্ঞান করত না-কখন কিছু খাইতে দিব এই আশায় ঘুরঘুর করত কাছেপিঠে। কুনদিন আঘাত করে না বইলা সক্কলে চিনা ফালাইছে, কেউ তারে ডরায় না। পাখির পালক দিয়া কুনদিন গিরগিটিরে কুতকুতি দিয়া দেখছেন?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল সালাম।

'না,' জবাব দিলেন জুলিখালা। 'তবে দিতে পারলে বোধহয় ভাল লগত।'

'ঠিকই ভাল লাগত। আমি দিছি। খুব আরাম পায় ব্যাটারা, চিৎ হইয়া গড়াগড়ি দেয়, মুখটা হা কইরা রাখে, হাসে কি না আল্লা মালুম। জগদীশ বাবু শিখাইছে আমারে। জানেন, সিটি দিয়া সাপেরে জাদু কইরা ফালাইতে পারে মানুষটা। কবে কোন ফুলট ফুটব কইয়া দিতে পারে!'

‘মনে হচ্ছে, এই অদ্রলোকের সাথেই বেশি সময় কাটিয়েছ তুমি, গাফিলতি করেছ রহিম সাহেবের কাজে। কি বলা?’

‘ঠিকই ধরছেন,’ অকপটে স্বীকার করল সালাম। ‘খেতের আগাছা তোলা আর নিড়ানি দেওয়ার চাইতে অনেক মজা বাবুর লগে ঘুইরা ঘুইরা এইসব দেখা। রহিম সাবে মনে করত এইসব পোলাপাইনা পাগলামি, গন্টার পর গন্ট পাখি আর পোকামাকর দেখা ল্যাংটা পাগলের কাম।’

‘হ্যাঁ, রহিম সাহেব একজন সৎ কৃষক। তার পক্ষে বোঝা কঠিন যে একজন প্রাণীতত্ত্ববিদের কাজও শুরুত্বের দিক থেকে কম কিছু নয়, আনন্দের কথা নাহয় বাদই দিলাম। বুঝলাম, এদিকে তোমার আগ্রহ আছে। কিন্তু এই পথে এগোতে হলে তোমাকে লেখাপড়ার দিকে জোর দিতে হবে, সালাম। অনেক...অনেক লেখাপড়া করে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার হয়েছেন ডক্টর জগদীশ ভট্টাচার্য। এই লাইন যদি সত্যিই তোমার পছন্দ হয়, তাহলে এ-বিষয়ে অনেক পড়াশোনা করতে হলে তোমাকে তোমার লেখাপড়াকে সহজ করার জন্যে একটা বুদ্ধি আছে আমার কাছে। আমি এই আলমারি দুটো দিয়ে দিতে পারি তোমাকে তোমার পাথর, পাখির ডিম আর ঝিনুক-শামুকের জন্যে। বারোটা ড্রয়ার আছে এতে। মাসে একটা করে ড্রয়ার পাবে তুমি, যদি মন দিয়ে লেখাপড়া করো, সবার সঙ্গে মিলেমিশে চলো আর ইস্কুলের নিয়ম ভঙ্গ না কর।’ হাসলেন জুলিখালা, ‘কি বলো? দেখবে চেষ্টা করে?’

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল সালাম, তারপর বলল, ‘আমার সাইদ্য

মতন চেষ্টা করুম, খালা।'

'আর একটা কথা। রোজ রাতের প্রার্থনার কথা মনে আছে তোমার? তোমার রহমান খালু যেটার কথা বার বার বলতেন?'

'আছে, খালা।'

'তুমি কি প্রার্থনা কর আল্লার কাছে?'

'না, খালা!' অস্ফুট কণ্ঠে বলল সালাম।

'করে দেখো,' বললেন খাল। 'তুমি এক পা এগোলে দেখবে তিনি দশ পা এগিয়ে এসেছেন তোমার দিকে।'

রাতে ঘুমাবার ঠিক আগের মুহূর্তে ছোটবেলায় মা'র কাছে যে ভাষা শিখেছিল, সেই ভাষায় মনে মনে তিনবার উচ্চারণ করল ও, 'আল্লাহ! সবার মঙ্গল করো আর, দয়া করে আমাকে ভাল হতে সাহায্য করো!'

ঝিরবির করে স্বর্গের শান্তি নামল সালামের অন্তরে। ভাবল, আরে, ইচ্ছে করলেই তো আমি এদের মত শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে পারি, বলি না কেন? বুঝল, লজ্জা লাগবে এখন ভাষা পাল্টাতে। যাক আরও কিছুদিন।

ঘুমিয়ে পড়ল ও।

সাত

‘আরে! অনেকটা সেরে এসেছে দেখছি!’ সাতদিন পর পরীক্ষা করতে এসে অবাক হয়ে গেলেন ডাক্তার। ‘এবার ওকে ক্রাচ দিতে পারেন, মিসেস রহমান। একটু হাঁটাহাটি করলে চট্ করে সেরে উঠবে ও। আর একমাস পর তো আমার ধারণা, মাঠময় গোল্লাছুট খেলতে পারবে।’

খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল তুহীন, ছুটল খবরটা বন্ধুদের জানাতে।

মুহূর্তে ভাল হয়ে গেল সালামের মনটা। এক জায়গায় শুয়েবসে কাটানো ওর কাছে কঠিন শাস্তি বলে মনে হচ্ছিল। কারও সাহায্য ছাড়া একটু নড়াচড়া করতে পারলেও নিজেকে স্বাধীন মনে হবে অনেকটা।

ছেলেদের খেলা দেখবে মনে করে উঠতে যাবে, এমন সময় দেখা করতে এলো খলিল ভাই, গাজী ফরিদ আর তপন মিত্র। তপনের দুই হাত পিছনে, কি যেন লুকিয়ে রেখেছে।

‘চলো, সালাম, একটু হেঁটে আসি মাঠ থেকে,’ বলল খলিল ভাই।

‘কেমনে? লাঠি লইয়া কি হাঁটা যায়? খারাও, খলিল ভাই, একটা ক্রাচ বানায়া নিতে তিনদিন লাগবো আমার, তারপর ঠিকই হাঁটতে পারুম।’

‘আরে, ক্রাচ বানাতে হবে না, চলো রওনা হই,’ হেসে বলল তপন। ‘মাঠে গিয়ে আজ আবার একচোট মারপিট করা যাবে!’

ঠাট্টা করছে বুঝতে পেরে হাসল সালাম। কিন্তু মুখের হাসি মিলিয়ে গেল তপন হাতদুটো পিছন থেকে সামনে আনতেই। তাজ্জব হয়ে চেয়ে রইল ও হালকা কাঠ দিয়ে বানানো ঝকঝকে নতুন একটা ক্রাচের দিকে। মুখ দিয়ে কেবল বেরোল, 'দারুণ তো!'

'গত তিনদিন খেটে তপন বানিয়েছে ওটা তোমার জন্যে,' বলল খলিল ভাই।

'তোমারে ধন্যবাদ, তপন।

'আরে দূর, সামান্য ব্যাপারে ধন্যবাদ রাখো। তাছাড়া আমি একা তো সবটুক করিনি; আমি কাঠামো তৈরি করেছি, সিরিশ কাগজ ঘষে এটাকে মসৃণ করেছে খলিল ভাই, আর রঙ করেছে গাজী ফরিদ। উঠে দাঁড়াও তো এটা বগলে নিয়ে, দেখি ট্রেযার আইল্যান্ডের সেই নাবিক দস্যু লং জন সিলভারের মত লাগে কি না।' সালাম ক্রাচে ভর দিয়ে দাড়াতে চারপাশ থেকে ঘুরে দেখে মন্তব্য করল, 'সবই মিলেছে, শুধু দুটো ডিফেক্ট রয়ে গেছে।'

'কি?' জানতে চাইল গাজী ফরিদ।

'কাঁধে বসা তোতাপাখিটা দেখছি না। আর পা-টা হাঁটু থেকে ক্লীন কাটা থাকতে হবে, এরকম ল্যাগব্যাগ করে ঝুললে চলবে না।'

'লও তোমার ক্রাচ,' বলল সালাম। 'নিজের পাওটা কাইটা লওগা যাও। আমার দস্যু হওনের কাম নাই।'

হো-হো করে হেসে উঠল তিনজন একসাথে।

বাইরে থেকে ঘুরে আসতেই দেখা গেল স্কুলের চেয়ারম্যান আসাদ চৌধুরী সাহেব মাঠে হৈ-হৈ করে খেলছেন পিচ্চিদের সাথে। সালামকে দেখে এগিয়ে এলেন, আন্তরিক গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'এই যে, পলাতক আসামী, পায়ের অবস্থা কেমন?'

'ভালর দিকে, স্যার,' জবাব দিল সালাম।

'আমাকে স্যার বলবে না, খবরদার! আমি মামা। তুহীনের দিকে ফিরে বললেন, লক্ষ্মী ছেলের মত এক দৌড়ে আমার গাড়ির সিটে রাখা বইটা নিয়ে এসো তো, তুহীন।'

তীরবেগে ছুটল তুহীন। ওদের তিনজনের সঙ্গে হেঁটে এসে সিঁড়ির ধাপে বসলেন মামা! মোটাসোটা একটা বই নিয়ে এলো তুহীন। ভুরুর ইঙ্গিতে সালামকে দেখিয়ে বললেন, 'ওকে দাও। তোমার জন্যে আনলাম, সালাম। বইটা দেখে মনে হলো তোমার ভাল লাগবে?'

দামী বই উপহার পেয়ে ঘাবড়ে গেল সালাম। পাতা উল্টে একেবারে তাজ্জব হয়ে গেল। নানান জাতের পাখি, প্রজাপতি আর কীট-পতঙ্গের রঙীন ছবি, দেখে মনে হয় একেবারে জীবন্ত-এক পাশে ইংরেজি ছোট অক্ষরে ওগুলোর বিবরণ আর জীবনবৃত্তান্ত লেখা। পাগলের মত পাতা উল্টাচ্ছে ও, অসংখ্য অজানা অচেনা কীট-পতঙ্গের ছবি দেখছে আর ভাবছে ইংরেজি জানা থাকলে আজ এদের সবার সম্পর্কে সবকিছু জেনে

নেয়া যেত।

ওর মনের ভাব টের পেয়ে হাসলেন আসাদ মামা, বললেন, 'হ্যাঁ। ইংরেজি জানা থাকলে অনেক সুবিধে। তবে ভাষাটা শিখে নিতে একটু সময় লাগে বটে, কঠিন না।'

ডক্টর রহমান এসে ঢুকলেন এমনি সময়ে। 'বাহ! সুন্দর হয়েছে তো ক্রাচটা। কে দিল? আসাদ মামা কিনে এনেছে?'

'না,' বলল সালাম। 'তপন বানাইছে, ঘষাঘষি আর রঙ করছে খলিল ভাই আর গাজী ফরিদ। মামা দিছেন এই সুন্দর বইটা।'

বইটা নেড়েচেড়ে দেখে প্রশংসা করলেন ডক্টর রহমান। 'এই বই একটা দেখেছিলাম আমার বন্ধু জগদীশের কাছে। খুব দামী বই। সালাম, তুমি তো এবার ফেঁসে গেলে, বাপ! ইংরেজি না শিখে আর তো কোন উপায় রইল না তোমার। এদের সম্পর্কে জানতে হলে আগে ইংরেজি জানতে হবে তোমার।' একটু হেসে বললেন, 'ক্রাচ পেয়ে গেছ, আর কি; কাল থেকে ক্লাস শুরু করে দাও, কি বলো?'

ঘাড় কাত করল সালাম।

বেশ কিছুদিন কেটে গেল শান্তিতে, তারপর একটা বিচ্ছিরি ঘটনা কাঁপিয়ে দিল ইসকুল বাড়ির নৈতিক ভিত।

কথায় আছে; অর্থই অনর্থের মূল। যদিও এটা ছাড়া আধুনিক দুনিয়া

অচল। দিলুর মুরগীগুলোই গোল বাধাল এবার। ওরা যদি নিয়মিত একের পর এক ডিম না দিত, তাহলে দিলুর অত টাকাও হতো না ওগুলো বিক্রি করে। প্রথম দিকে অল্প টাকা জমলেই যা খুশি তাই কিনে বাজে খরচ করত বলে ওকে একটা টিনের তৈরি ব্যাঙ্ক কিনে দিয়েছেন রহমান খালু। আইন করে দিয়েছেন; যা আয় হবে সব ওর মধ্যে রাখতে হবে, পাঁচশো টাকা জমার আগে কিছুতেই খুলতে পারবে না ওটা, আর বিচক্ষণতার সাথে খরচ করতে হবে টাকাটা।

আর মাত্র আশিটাকা হলেই জমে যায় পাঁচশো টাকা। বেশ কিছুদিন ডিমের দাম নেয়নি সে জুলিখালার কাছ থেকে, আজ এক সাথে পাঁচ ডজনের দাম একশো টাকা হাতে পেয়ে নাচতে নাচতে ছুটল সে গোলাঘরের দিকে তুহীনকে দেখাবে বলে। পাঁচটা ঝকঝকে নতুন বিশ টাকার নোট।

তুহীনও জমাচ্ছে টাকা। ওরও ষাট-সত্তর টাকা জমে গেছে রহমান খালুর কাছে। দিলুর টাকা দেখে খুব খুশি হলো ও, নতুন নোটের গন্ধ শুকে দেখল, বলল, 'ইশশ! এত টাকা আমি পেলে আর বেশিদিন লাগত না আমার বেহালা কিনতে!'

'আমি এখনও ঠিক করিনি টাকা দিয়ে কি করব,' বলল দিলু। 'হয়তো তোমাকে কিছু টাকা ধারও দিতে পারি।' নাকের কাছে নিয়ে নিজেও চোখ বুজে শ্বাস টানল দিলু তৃপ্তির সাথে।

গোলাঘরের বাইরে থেকে সালাউদ্দীনের গলার আওয়াজ ভেসে এলো, 'জলদি চলো, তপন! ঝর্নার ধারে ইয়া বড় এক সাপ ধরেছে খচ-মানে, সালাম!'

'চলো, দেখিগে!' বলেই গম ঝাড়ার পুরনো মেশিনের মাথায় টাকাগুলো রেখে দিয়ে ছুট লাগাল দিলু। তুহীনও ছুটল ওর পিছন পিছন।

সত্যিই, দারুণ এক সাপ, দেখলেই গায়ের ভেতর শিরশির করে। ওর জোড়াটাকে খোঁজা হলো অনেকক্ষণ, পাওয়া না যাওয়ায় এক ঘণ্টা দাবড়ে ডানায় চোট খাওয়া একটা কাক ধরল ওরা সেবা-শুশ্রুষা করে সারিয়ে তুলবে বলে। এসব উত্তেজনাপূর্ণ জরুরী কাজ করতে গিয়ে বেমালুম ভুলে গেল দিলু টাকাগুলোর কথা। রাতে খেয়েদেয়ে বিছানায় ওঠার পর আচমকা মনে হলো, আরে! টাকাগুলো গেল কোথায়?

কোথায় রেখেছে মনে পড়ায় নিশ্চিন্ত হয়ে পাশ ফিরল ও, কোনও চিন্তা নেই, তুহীন ছাড়া আর কেউ জানে না কোথায় রয়েছে ওগুলো।

কিন্তু পরদিন সকালে সবাই যখন স্কুল ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে, হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে এলো দিলু, 'আমার একশো টাকা কে নিয়েছো, বের করো!'

'কি বলছ তুমি? কিসের টাকা?' জিজ্ঞেস করল খলিল ভাই।

টাকা খোয়া যাওয়ার কথা ভেঙে বলল দিলু, ওর বক্তব্য সমর্থন করল তুহীন। বলল, ও ছিল তখন ওখানে।

কিন্তু অস্বীকার করল সবাই। বলল, কোথায় টাকাগুলো রাখা হয়েছিল তা-ই জানে না ওরা, নেয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। তুহীনও জোর গলায় বলল যে দিলু আর ও ছাড়া আর কেউ ছিল না তখন গোলাঘরে। এইবার সবাই তাকাতে শুরু করল তুহীনের দিকে। টাকাগুলো কোথায় ছিল তা যখন আর কেউ জানেই না, তখন ওরা নিতে পারে না-কথাটা যুক্তিযুক্ত। তাহলে কে নিতে পারে?

সবার চোখের দৃষ্টি ওর মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে দেখে অস্বস্তিতে ভুগছে তুহীন। বুঝতে পারছে না কেন ওরা এভাবে তাকাচ্ছে ওর দিকে। তারপর হঠাৎ বুঝতে পেরে কুঁকড়ে গেল একেবারে।

'কিন্তু কেউ না কেউ তো নিশ্চয়ই নিয়েছে। তাই না?' বলল খলিল ভাই।

মুঠি পাকিয়ে ওদের নাকের সামনে হাত ঝাঁকাল দিলু, 'চোর যদি ধরতে পারি, এমন শিক্ষাই দেব-জীবনে ভুলতে পারবে না!'

'চেইতো না, দিলদার,' বলল সালাম। 'কে নিছে বাইর কইরা ফালামু। চিন্তা কইরো না, চোর ধরা পড়বই।' কথা শুনে মনে হলো চোর ধরার কায়দা জানা আছে ওর।

'হয়তো কোন ভবঘুরে রাতে ঘুমাবে বলে ঢুকেছিল গোলাঘরে, সকালে উঠে কেটে পড়েছে টাকাগুলো নিয়ে,' বলল সালাউদ্দীন আলী।

'না, রুস্তম আলী কাউকে ঢুকতে দেবে না ওখানে,' বলল তপন

মিত্র। ভুরু জোড়া কুঁচকে গেছে ওর। 'তাছাড়া পুরনো একটা গম ঝাড়ার মেশিনের মাথায় টাকা খুঁজতে যাবে না কেউ।'

'রুস্তম আলী নিজেই সরায়নি তো?' প্রশ্ন তুলল গাজী ফরিদ।

'বাহ্, আকাশ থেকে পেড়ে আনলে একটা কথা!' রেগে উঠল দিলু। 'এ কাজ কিছুতেই রুস্তম আলীর হতে পারে না। ওর ভেতরটা দিনের মতন পরিষ্কার। একটা পয়সা খুঁজে পেলেও খালুর কাছে জমা দেয়।'

'যেই নিয়ে থাকো, ধরা পড়ার আগেই বলে ফেলো,' চট্ করে তুহীনের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে বলল কাঞ্চন।

লাল হয়ে উঠল তুহীনের মুখটা। বেসুরো গলায় বলল, 'বুঝতে পারছি, আমাকেই চোর মনে করছ তোমরা!'

'একমাত্র তুমিই জানতে কোথায় ছিল টাকাগুলো,' বলল খলিল ভাই। 'রাখার সময় তুমি ছিলে ওখানে।'

'ছিলাম, স্বীকার করছি। কিন্তু আমি নেইনি। দিলুর টাকা আমি চুরি করিনি-বিশ্বাস করো, আমি না!' চেঁচিয়ে উঠল তুহীন।

'আস্তে! আস্তে হৈ-চৈ করো!' হাসিমুখে ঘরে ঢুকলেন রহমান খালু। 'কি নিয়ে গোলমাল এতো?'

টাকা খোয়া যাওয়ার ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত বলল দিলু আবার। শুনতে শুনতে ভয়ানক গম্ভীর হয়ে উঠল খালুর মুখ। কারণ, দোষ-ত্রুটি যাই থাকুক, দুষ্টামি যতই করুক; আজ পর্যন্ত ইসকুল বাড়ির ছেলেরা কেউ

করেনি এই জঘন্য কাজ।

‘সবাই নিজের সিটে বসে পড়ো,’ বললেন খালু। সবাই বসলে শান্ত কণ্ঠে বললেন, ‘তোমাদের প্রত্যেককে আমি একটা প্রশ্ন করব, আশা করব সত্যি কথা বলবে। একটা অন্যায় করা হয়েছে দিলুর প্রতি, সেটা শুধরে নেয়ার এখনই সুযোগ। এখানে সবার সামনে যদি দোষী ব্যক্তি নিজের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আমাদের পক্ষে মাফ করে দেয়া সহজ হবে। চুরিই যথেষ্ট, তার সঙ্গে আবার মিথ্যা বলে কলঙ্কিত কোরো না নিজেকে।’

থামলেন রহমান খালু। সবাই চুপ। তারপর একে একে প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করলেন তিনি একই প্রশ্ন। একই উত্তর এলো সবার কাছ থেকে। সবাই উত্তেজিত হয়ে আছে, তাই মুখ দেখেও কিছু আঁচ করা গেল না। ছোট ছেলেদের কেউ কেউ ঘাবড়ে গিয়ে ‘আমি না’ শব্দ দুটো উচ্চারণ করতেও হোচট খেল, কথা আটকে গেল মুখে, যেন কাজটা তারই। যদিও সবাই জানে সে ওকাজ করতেই পারে না। তুহীনের পালা এলে গলাটা যতদূর সম্ভব নরম করলেন খালু। ওর বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে তার মায়াই হলো। সবার মত তারও ধারণা, কাজটা ওরই; তিনি অভয় দিয়ে দোষ স্বীকার করাটা ওর জন্যে সহজ করে দিতে চাইলেন।

‘কোনও ভয় নেই, তুহীন। সত্যি কথাটা বলো আমাকে। তুমি নিয়েছ টাকাগুলো?’

‘না, খালু, আমি নেইনি!’ গলা কাঁপছে ওর, দুই চোখে করুণ মিনতি, যেন বলতে চায়, ওকে বিশ্বাস করে সন্দেহ থেকে মুক্তি দেয়া হোক। ‘সত্যিই আমি না!’

কেউ একজন ‘হিসস’ করে শব্দ করে উঠল। খটাশ করে টেবিলে বেতের বাড়ি মারলেন রহমান খালু। ‘থামো!’ বলে যেদিক থেকে শব্দটা এসেছে সেদিকে চাইলেন কড়া চোখে। সালাউদ্দীন, গাজী ফরিদ আর তপন বসেছে ওখানে পাশাপাশি । দুজন মাথা নিচু করল, কিন্তু তপন বলল, ‘আমি ওই আওয়াজ করিনি, খালু। যে বেচারা পড়ে গেছে মাটিতে, তাকে আঘাত করতে আমি লজ্জা বোধ করব।’

‘কারণ, টাকাটা তোমার নয়!’ তিক্ত কণ্ঠে বলল দিলু। টাকা হারিয়ে ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে, দিলদরিয়া ভাবটা গায়েব।

‘চুপ করো!’ ধমক দিলেন রহমান খালু। তারপর নরম গলায় বললেন, ‘আমি খুবই দুঃখিত, তুহীন। সাক্ষ্য-প্রমাণ তোমার বিরুদ্ধে। তাছাড়া তোমার মিথ্যে বলার পুরনো অভ্যাস থাকায়, কেউ তোমার কথায় বিশ্বাস রাখতে পারছে না। তবে জেনে রাখো, বাছা, আমি তোমার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনছি না; নিশ্চিত, অকাট্য প্রমাণ না পেলে কোনও শাস্তিও দেব না। ব্যাপারটা আমি তোমার বিবেকের ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। তুমি যদি কাজটা করে থাক, দিনে-রাতে যে-কোনও সময় আমার কাছে দোষ স্বীকার করতে পার; আমি তোমাকে ক্ষমা করব, নিজেকে শুধরে নিতে সাহায্য করব। আর তুমি যদি নিরপরাধ হও, আগে হোক

পরে হোক, সত্যটা একসময় বেরিয়ে আসবেই। যদি আসে, সবার আগে তোমাকে সন্দেহ করার জন্যে আমি নিজে তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব।'

'আমি নেইনি। আমি নেইনি, খালু! সত্যিই আমি নেইনি।' বলতে বলতে ডুকরে কেঁদে উঠল তুহীন, দুই হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাল কিছুক্ষণ, তারপর একেবারে চুপ হয়ে গেল।

ছেলেটাকে এভাবে কাঁদতে দেখে যদি কেউ স্বীকার করে ফেলে অপরাধ, ভেবে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন রহমান খালু। কিন্তু কেউ টুঁ-শব্দটি করল না। দুঃখিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন তিনি।

'এ ব্যাপারে আর কিছুই করার নেই আমাদের,' বললেন তিনি সবার উদ্দেশে। 'শুধু একটা কথা: নিশ্চিত না জেনে, শুধু সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে কাউকে দোষারোপ করতে নেই। যাকে সন্দেহ করা হয় তার সঙ্গে আগের মত সহজ হয়তো হতে পারবে না, কিন্তু আমি আশা করব, সন্দেহভাজনকে তোমরা কেউ কোনভাবে জ্বালাতন করবে না। এবার যে-যার পড়ায় মন দাও।'

বই খুলতে খুলতে তপনের কানে-কানে বলল সালাউদ্দীন, 'চোর ব্যাটা অতি সহজেই পার পেয়ে গেল!'

'জিভটা সামলিয়ে রাখো!' ধমক দিল তপন। ওর কাছে ঘটনাটা গোটা পরিবারের সম্মানের ওপর কঠিন আঘাত বলে বোধ হচ্ছে।

বেশির ভাগ ছেলেই সালাউদ্দীনের সাথে একমত। ওদের ধারণা খালু যখন সুযোগ দিয়েছিলেন তখনই সে-সুযোগটা নেয়া উচিত ছিল তুহীনের। তাহলে চুকে যেত ব্যাপারটা। কিন্তু যেহেতু কিছুতেই দোষ স্বীকার করল না ছেলেটা, কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে ওকে।

একটা কিল, ঘুসি বা বেতের বাড়ি পড়ল না ওর গায়ে। দেখা গেল কেউ ওর সাথে কথা বলছে না, কেউ মিশছে না। বাঁকা চোখে দেখছে সবাই, দৃষ্টিতে সন্দেহ। এমন কি জুলিখালার চেহারাতেও, যতই ভাল ব্যবহার করুন, সন্দেহ দেখতে পেয়ে কুঁকড়ে গেছে তুহীন। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ লেগেছে ওর রহমান খালুর আহত দৃষ্টি দেখে। ওর কাছ থেকে চুরি ও মিথ্যা-একই সঙ্গে এই দুই পাপ তিনি আশা করেননি।

গোটা ইসকুল বাড়িতে একজনই মাত্র পুরোপুরি বিশ্বাস রেখেছে তুহীনের ওপর। মণি। জোর গলায় প্রতিবাদ করেছে ও সবার সব কথা। কেন সে তুহীনের পক্ষ নিয়েছে তার কোনও ব্যাখ্যা নেই ওর কাছে, ও শুধু বলতে পারে ওর বিশ্বাসের কথা-তুহীনের দ্বারা একাজ করা সম্ভব নয়। কারও কোন যুক্তি ও শুনতে রাজি নয়, এমন কি ভাই কাঞ্চন যখন বলল, এটা তুহীন ছাড়া আর কারও কাজ নয়, কারণ আর কেউ জানতই না কোথায় রেখেছিল দিলু টাকাগুলো-তখন প্রিয় ভাইয়ের গায়ে হাত তুলতেও ওর বাধেনি।

‘তুমি কি জান, কোনও গরু হয়তো খেয়ে নিয়েছে টাকাগুলো বাজে কাগজ মনে করে,’ বলেছে ও। ওর কথায় যখন হেসে উঠেছে কাঞ্চন,

তখন খেপে গিয়ে ঠাস করে চড় মেরে বসেছে ওর গালে। তারপর কাঁদতে-কাঁদতে ছুটে চলে গেছে আর এক দিকে। তখনও চেঁচাচ্ছে, 'ও করেনি, করেনি, করেনি!'

ওর এই অন্ধবিশ্বাস ভেঙে দেয়ার চেষ্টা করেননি খালা বা খালু, মনে মনে কামনা করেছেন ওর এই বিশ্বাস যেন সত্যে পরিণত হয়।

এই ছোট্ট মেয়েটার বিশ্বাস তুহীনের জন্যে বিরাট এক সান্ত্বনা হয়ে দাড়াল, ওর মনে হলো আসুক আরও ঝড়-ঝাপটা, ও ঠিকই সহ্য করতে পারবে। এই দুনিয়ায় একজন তো আছে যে ওর ওপর বিশ্বাস রেখেছে। কেউ যখন কথা বলছে না ওর সঙ্গে, কেউ যখন মিশছে না, মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে; তখন ওদের চ্যালেঞ্জ করেই যেন ওদের দিকে পিছন ফিরে ওর সঙ্গে আরও ভাল ব্যবহার করছে মণি। এখন আর সিঁড়িতে বসে থাকে না ও, তুহীন যখন বেহালা বাজায়, ওর পাশে এসে বসে। মণির মমতা তুহীনকে এতটাই স্পর্শ করল যে আর সবার চরম অপমান সহ্য করে নেয়ার শক্তি পেয়ে গেল। মণি যখন ওর পড়া নিয়ে এলো ওর কাছে বুঝতে, কিংবা ওর জন্যে ভাল-মন্দ যাই হোক নিজ হাতে রান্না করে নিয়ে এলো, চিরকৃতজ্ঞ হয়ে গেল তুহীন, কেনা গোলাম হয়ে গেল ওর।

আর মাত্র একজন ওর ওপর আস্থা প্রকাশ করেছে। সে হচ্ছে সালাম। কেউ তুহীনের প্রতি খারাপ ব্যবহার করলে ঘুসি পাকিয়ে ছুটে গেছে ও। মণির মতই দুর্বল ছেলেটাকে রক্ষা করার নৈতিক দায়িত্ব তুলে নিয়েছে নিজের কাঁধে। কিন্তু স্বীকার করে না সেকথা। মুখে বলে, 'ম্যান্দা

ব্যাটা আমার দুইচোক্ষের বিষ!'

ঝর্নারে ধারে একদিন জল-মাকড়সার চালচলন, সবভাব-চরিত্র লক্ষ করছিল, এমন সময় দেয়ালের ওপাশ থেকে কিছু কথা কানে এলো সালামের। বোঝা গেল তুহীনকে জেরা করে আসল ঘটনা বের করার চেষ্টা করছে গোয়েন্দা সালাউদ্দীন। ও জানতে চায়, এত অবজ্ঞা ও ঘৃণার পরেও তুহীন কিছুতেই স্বীকার করছে না কেন। ডক্টর রহমান স্পষ্ট আভাস দিয়েছেন স্বীকার করলেই নির্যাতন থেকে রক্ষা পাবে চোর, তারপর আর স্বীকার করতে অসুবিধা কোথায়? অদম্য কৌতুহল মিটাতে আগেও কয়েকবার গোপনে হুমকি-ধামকি দিয়েছে তুহীনকে, কিন্তু স্বীকারোক্তি বের করতে পারেনি। আজ দেয়ালের ছায়ায় বসে ওকে বই পড়তে দেখে এসেছে শেষ চেষ্টা করে দেখত। তুহীনের অনুনয় শুনে বোঝা গেল সালাম আসার আগে থেকেই চলছে জেরা।

কাতর কণ্ঠে বলছে তুহীন, 'খামোখা আমাকে খুঁচিয়ো না, সালাউদ্দীন, প্লিজ! আমি নিজে না জানলে কি করে বলব তোমাকে? বার বার বলেছি আমি জানি না, তারপরেও কেন লেগে আছ আমার পেছনে? রহমান খালু নিষেধ করার পরও তুমি দিনের পর দিন একই কথা নিয়ে খুঁচিয়ে চলেছ আমাকে। কাছেপিঠে সালাম থাকলে কিছুতেই তোমার এ সাহস হতো না।'

'আরে, রাখ তোর সালাম,' খেঁকিয়ে উঠল সালাউদ্দীন। 'ওকে কে ডরায়? তোরই মত রাস্তার ছোকরা ও একটা। আমরা ভদ্রলোকের

ছেলেরা একজোট হয়ে প্যাঁদানি দিলে ওয়ালাইকুম সালাম হয়ে যাবে-পালিয়ে পথ পাবে না। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, ও-ই নিয়েছে দিলুর টাকাটা, তুই জানিস কিন্তু বলছিস না। কি, ঠিক বলেছি?'

'অসম্ভব! একাজ ওর হতেই পারে না। ও চোর না। আর যদি আমি জানতাম ও-ই করেছে, তাহলে প্রথম দিনই তোমাদের কাছে স্বীকার করতাম, কাজটা আমার।' কথাটা শুনেই ধন্যবাদ দেয়ার জন্যে উঠে দাড়াতে যাচ্ছিল সালাম, কিন্তু পরবতী কথায় থমকে গেল।

'কেন? চোরে-চোরে মাসতুত ভাই?'

'ও আমার জন্যে যা করেছে, সে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। ওকে বুঝতে হলে ওর মত মস্ত বড় মনের মানুষ হতে হবে তোমাকে।'

'দ্যাখ, ছোটলোকের বাচ্চার সঙ্গে আমার তুলনা করবি না! নইলে এক ঘুসিতে নাক-মুখ ছেঁচে দেব! ব্যাটা, সাহস কত! শোন, আমি জানি কাজটা ওর। এখানে আসার আগে ও রেলেবাসে পকেট মারত, একথা আমার কানে এসেছে। তুই সব জেনেও ওকে এখানে নিয়ে এসেছিস দুজন একসাথে মিলেজুলে চুরি করবি বলে।' তুহীনকে রাগিয়ে দিয়ে সত্য উদঘাটন করতে চেষ্টা করছে নীচ মনের ছেলেটা। 'নে, আর লুকিয়ে কোনও লাভ নেই, স্বীকার যা।'

তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল তুহীন, 'দেখো, সালাউদ্দীন, আবার যদি এই কথা বলো, সোজা গিয়ে রহমান খালুকে নালিশ করব আমি। নালিশ আমি

পছন্দ করি না, তাই এতদিন কাউকে কিছু বলিনি, কিন্তু সালামকে জড়িয়ে যদি এসব কথা বলো, ঠিকই নালিশ করব আমি-মারের ভয় দেখিয়ে আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।'

'তাহলে আরেকটা টাইটেল জুটবে তোর কপালে। মিথ্যুক আর চোর তো আছিসই, চুকলিখোর ডিগ্রীটাও পেয়ে যাবি!' বোঝা গেল তুহীনের হুমকিকে পাত্তাই দিচ্ছে না সালাউদ্দীন, ভাবছে, নিজেকে রক্ষার জন্যে যে নালিশ করতে পারে না, সে আবার আরেকজনের জন্যে প্রিন্সিপালের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে কোন সাহসে?

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল সালাউদ্দীন আলী, হঠাৎ কলারে টান অনুভব করল। লম্বা একটা হাত এক ঝাঁকিতে ওকে দেয়াল পার করে এপাশে নিয়ে এলো, তারপর ছুড়ে দিল ঝর্নার মাঝখানে। সমস্ত ব্যাঙচি আর জল-মাকড়সার আত্মা চমকে দিয়ে ঝপাৎ করে পানিতে পড়ল ছোটদের যম, হাড়িডসর্বস্ব সালাউদ্দীন; পানি ছিটকে উঠে ভিজিয়ে দিল পাড়।

'মুরগী কুনহানকার! আবার যদি জ্বালাতন করস তুহীনরে, তরে পিটাইয়া লম্বা কইরা সিদা হাসপাতালে পাঠায়া দিমু, কসম খোদার?'

'আমি তো ঠাট্টা করছিলাম,' বলল আতঙ্কিত বাহাদুর।

'আমিও তো ঠাট্টাই করতাছি,' বলল সালাম চোখ গরম করে। 'আবার যদি দেহি কারও পিছে লাগছস, এমনই ঠাট্টা করুম যে এক্কেরে

প্যান্ট খরাব কইরা ফালাবি। যা, উঠ, দূর হ এইখান থেইকা।'

চুপচুপে ভেজা কাপড় নিয়ে উঠে এলো ও, একটা চুবানি খেয়েই গোয়েন্দাগিরির শখ মিটে গেছে ওর। ব্যাখ্যা দেয়ার জন্যে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, কিন্তু সালামের ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠতে দেখে আর একমুহূর্ত দেরি করা ঠিক হবে না ভেবে রওনা হয়ে গেল বাড়ির দিকে।

দেয়াল টপকে তুহীনের পাশে চলে এলো সালাম। দেখল, কুঁকড়ে কুঁজো হয়ে বসে আছে বেচারা। অবহেলা আর ঘৃণা নরম মনের ছেলেটাকে একেবারে শেষ করে দিয়েছে।

'ও আর জ্বালাইব না তোমারে। যদি এর পরেও ত্যক্ত করে, আমারে কইবা, এক্কেরে ফাটায়া ফালামু।' কাছেই বসে পড়ল ও।

'আমাকে যা খুশি বলুক, সবাই তো বলছে, অতটা গায়ে লাগে না আমার, অভ্যাস হয়ে গেছে,' করুণ কণ্ঠে বলল তুহীন। 'কিন্তু এখন দেখি তোমাকে-সুদ্ধ জড়াতে চাইছে ওরা।'

'কেমনে জানো আমি এর মইধ্যে নাই?' হঠাৎ এক পাশে মুখ ফিরিয়ে জানতে চাইল সালাম।

'কি? টাকা চুরির ব্যাপারে?' চমকে ওর দিকে তাকাল তুহীন।

'হ।'

'আমি বিশ্বাস করি না!' ঘোষণা করল ও। 'টাকার ওপর কোন লোভ নেই তোমার। মনে নেই, আমি যে একবার আব্বার দুইশো টাকা

হারিয়ে ফেলেছিলাম, তুমি তখন...'

'বুজলাম,' চট করে তুহীনকে থামিয়ে দিল সালাম। 'তোমার যিমুন বেহালা কিনন দরকার, আমারও তো একটা নেট দরকার প্রজাপতি ধরনের।' এখনও অন্যদিকে চেয়ে রয়েছে ও।

'উঁহু, তোমার পক্ষে এটা সম্ভব না। মাঝে-মাঝে অন্যায় মারপিটে জড়িয়ে যাও ঠিকই, কিন্তু মিথ্যে কথা বলার লোক তুমি না। নাহ, তুমি চুরি করতে পার এ আমি বিশ্বাস করি না।' প্রবল ভাবে মাথা নাড়ল তুহীন, 'তুমি বললেও না।'

'অথচ ওই দোনো কাজই করছি আমি। একসময় দিনরে রাইত বানায়া ফালাইছি মিছা কথা কইয়া; আর রহিম সাবের খামার থেইকা পলাইয়া আসার সময় মাইনষের খেত থেইকা এইটা-ওইটা খাইছি চুরি কইরা। ভাল হইলাম কেমনে?'

'না, সালাম, তুমি আবার বলে বোসো না ওই কাজট তোমার। আমি বিশ্বাস করতে পারব না। আমার ধারণা, ওটা ওই ভাল ছেলেদেরই কারও কাজ।'

মুখ ফিরিয়ে রহস্যময় হাসি হাসল সালাম। ওর জানা হয়ে গেছে যা জানার। মুখে বলল, 'কিছুই কমু না আমি। তুমি চিন্তা কইরো না। জাল কাইটা বাইর হইয়া যামু আমরা, দেইখো।'

উদগ্রীব দৃষ্টিতে চাইল তুহীন ওর মুখের দিকে। মনে হলো কে

নিয়েছে হয়তো জানে সালাম। বলল, 'তুমি যদি সত্যিই জান কে নিয়েছে, ওকে স্বীকার করতে অনুরোধ কোরো, সালাম। বড্ড কষ্ট হয় যখন ভাবি বিনা কারণে ওরা আমাকে ঘৃণা করছে, মেলামেশা বন্ধ করে দিয়েছে। দম আটকে আসে মাঝে মাঝে, মনে হয় আর সহ্য করতে পারব না। কোথাও যদি আমার যাওয়ার জায়গা থাকত, আমি পালিয়ে যেতাম এখান থেকে। এখান থেকে যেতে কষ্ট হতো, তবু পালাতাম। কিন্তু তোমার মত সাহস বা শক্তি আমার নেই, তাই চুপচাপ সব অপমান সহ্য করে এখানেই থাকতে হচ্ছে আমাকে। অপেক্ষা করছি, কেউ হয়তো কোনভাবে ওদের বোঝাতে পারবে মিথ্যে বলিনি আমি, কাজটা সত্যিই আমার নয়।'

কথাগুলো বলতে বলতে গাল দুটো কুঁচকে উঠল তুহীনের, দুই চোখে টলমল করছে দু'ফোঁটা পানি। দেখে চট্ করে উঠে পড়ল সালাম, সান্ত্বনা দিল, 'আর বেশিদিন সইয্য করতে হইব না।' তারপর দ্রুতপায়ে চলে গেল।

কেমন যেন বদলে গেছে সালাম-সবাই বলাবলি শুরু করল ওর সম্পর্কে। পরের কটা দিন কারও সঙ্গে তেমন কথা বলল না, একসঙ্গে হাঁটতে বেরিয়েও সরে থাকল আলাদা হয়ে। সব সময় এতই চিন্তামগ্ন থাকে যে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করতেও সাহস পায় না। প্রতিদিন সন্ধের আড্ডায় একটা কথাও বলে না আজকাল। একটু আড়ালে ছায়ায় বসে বিভোর হয়ে থাকে নিজের চিন্তায়। জুলিখালার 'বিবেক' খাতায় নিজের সম্পর্কে

অত্যন্ত ভাল রিপোর্ট দেখেও কোনও ভাবান্তর হয় না ওর।

‘তোমার কি শরীর খারাপ, সালাম?’ জানতে চান জুলিখালা।

‘পায়ে একটু ব্যথা করতাছে, যাই, শুইয়া পড়ুম,’ বলে বিদায় নিয়ে আলগোছে চলে যায়।

‘খুব সম্ভব অপদস্থ তুহীনের কারণেই ওর এই অবস্থা হয়েছে,’ একদিন বললেন জুলিখালা। ‘এত ভাল করছে লেখাপড়ায়, অথচ রিপোর্ট দেখে খুশি হতে পারছে না কেন যেন।’ ছেলেটাকে ইদানীং কেমন যেন দুর্বোধ্য ঠেকছে তার কাছে।

মনে গভীর দুঃখ পেল তুহীন, যেদিন দেখল ‘দিলদার বেগ অ্যান্ড কোং’ লেখাটা মুছে ফেলা হয়েছে। দিলুকে জিজ্ঞেস করতে ও বলল, ‘তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না তুহীন, তবু বলতে হচ্ছে, আমি আর টাকা খোয়াতে রাজি নই; আমাদের কোম্পানীটা ভেঙে দেয়াই উচিত।’

মাথা নিচু করে সরে যাচ্ছিল তুহীন, দিলু আরও বলল, ‘বিশ্বাস না থাকলে পার্টনারশিপ ব্যবসা হয় না। সবার ওপর থেকে বিশ্বাস হারিয়েছি আমি। অতএব, সব শেষ।’

‘কাউকে তো জোর করে বিশ্বাস করানো যায় না কিছু,’ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল তুহীন। ‘আর কারও কথায় আমি কিছু মনে করতাম না, শুধু তুমি যদি একটিবার বলতে তোমার মনে হয় না যে আমি নিয়েছি তোমার

টাকা, তাহলে বর্তে যেতাম। যাকগে, তুমি বললে এখনও আমি তোমার ডিম খুঁজে দিতে পারি; কিছু দিতে হবে না আমাকে। তুমি সব ডিম খুঁজে পাবে না, সব জায়গা তুমি চেনো না।'

কথায় বলে: জিনিস যায় যার, ঈমান যায় তার। সন্দেহ ফুটে উঠল দিলুর চেহারায়। মাথা নাড়ল। বলল, 'না। সব জায়গা তুমি না চিনলেই আমি খুশি হতাম। যাই হোক, আমার অজান্তে আবার খোজাখুঁজি করতে যেয়ো না।'

এই একটি কথায় মাটিতে মিশে গেল তুহীন।

নতুন কোন পার্টনারও নিল না দিলু। অবিশ্বাস ঢুকে পড়েছে ওর মধ্যে। সালাউদ্দীন ঢোকার চেষ্টা করেছিল তুহীনের জায়গায়, কিন্তু মাথা নেড়েছে ও। মুন্নাকে ট্রেনিং দিয়ে নিয়েছে। কিভাবে ডিম খুঁজতে হয় এবং অক্ষত অবস্থায় এনে দিতে হয় শিখে ওর খুশি আর ধরে না। বিনিময়ে একটা লজেন্স বা চকোলেট পেলে আরও খুশি। ওকে বিশ্বাস করার প্রধান কারণ, কিছু মনে রাখতে পারে না ও প্রতিদিন মনে করিয়ে দিতে হয় ডিম খোঁজার কথা।

সালাম যেদিন জুলিখালার সঙ্গে দুর্বোধ্য ব্যবহার করল, ঠিক তার পরদিন সকালে অনেক খুঁজে দুটো ডিম নিয়ে এলো মুন্না।

'দিন দিনই কমে যাচ্ছে!' গজগজ করল দিলু। 'তুহীন কোন কোনদিন ছয়টা ডিমও পেত। তুমি এক কাজ করো, মুন্না; ওগুলো রেখে

আমাকে একটুকরো চক পেড়ে দাও ওপর থেকে।'

গম ঝাড়ার মেশিনের ওপর উঠে হাত বাড়াল মুন্না চকের জন্যে। বলল, 'অনেক টাকা দেখা যায়, দিলু।'

'না দেখা যায় না,' জবাব দিল দিলু। 'ভেবেছ আবারও টাকা রাখব আমি ওখানে চুরি যাওয়ার জন্যে?'

'আমি দেখতে পাচ্ছি। এক, দুই, পাচঁ, ছয় টাকা।

'কী গাধারে, বাবা! বললাম একটা চক পেড়ে দাও, তিনি গুনছেন টাকা!' নিজেই লাফিয়ে উঠল দিলু মেশিনের উপর, তারপর আঁতকে উঠল টাকা দেখে। বিশ টাকার পাঁচটা নোট, সেই সাথে টাকাটা কার তা বোঝাবার জন্যে একটা চিরকুটে ওর নাম লেখা। 'তাজ্জব কারবার!' বলে ছোঁ দিয়ে তুলে নিল ও টাকাগুলো । তারপর ছুটল বাড়ির দিকে। পাগলের মত চেঁচাচ্ছে, 'পাওয়া গেছে! পাওয়া গেছে আমার টাকা! তুহীন কোথায়?'

তুহীনকে ডেকে আনা হলো ওর ঘর থেকে। টাকা পাওয়া গেছে শুনে যেমন তাজ্জব তেমনি খুশি হলো ও। আন্তরিক হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ওর মুখটা। কিন্তু যখন জানতে চাওয়া হলো টাকাগুলো ও ফেরত দিল কি মনে করে, তখন আবার মলিন হয়ে গেল হাসিটা। বলল, 'আমি একবার বলেছি আমি নিইনি। এখন আবার বলছি, ফেরতও দিইনি। কোত্থেকে দেব? আমার নিজের অত টাকা নেই, যা আছে সব

খালুর কাছে। দয়া করে তোমরা বিশ্বাস করো, একাজ আমার না!'

ওর বিস্ময় ও নির্ভেজাল আনন্দ এবং সবশেষে হাসি মলিন হয়ে যাওয়া দেখে দ্বিধায় পড়ে গেল ছেলেরা। ওদের মনে হলো হয়তো মস্ত অন্যায় করছে ওরা এতদিন ধরে এই নরম-সরম, গরীব ছেলেটার ওপর, জোরে প্রতিবাদ করারও যার সাহস নেই। ওর পিঠে চাপড় দিল কমোডোর তপন মিত্র, 'আর কেউ বিশ্বাস করুক বা না করুক, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, তুহীন।'

'আমিও!' ঘোষণা দিল দিলু। কেবল টাকা ফেরত পেয়ে নয়, এতদিনের একটা মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পেয়ে আনন্দে আত্মহারা। 'তুমি নাওনি জেনে খুব ভাল লাগছে আমার, তুহীন।' তুহীনের সঙ্গে হাত মেলাল ও আন্তরিকতার সাথে। বলল, 'কিন্তু আসলে যে কে নিয়েছিল বোঝা গেল না।'

'অত জাইনা কি হইব, পাওয়া যে গেছে তাই তো তোমার কপাল!' বলল সালাম, তুহীনের আনন্দে উদ্ভাসিত মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে ও।

'আজ হোক, কাল হোক, ধরা ওকে পড়তেই হবে,' বলল খলিল ভাই। হাতের লেখাটা পরীক্ষা করছে আর মাথা নাড়ছে। 'নাহ, আমাদের এখানকার কারও লেখা না।'

ডক্টর রহমান সব শুনে খুশি হলেন। যাক, টাকাগুলো ফেরত দিয়ে সঠিক পথে প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছে দোষী, এরপর হয়তো আরও কিছু

জানা যাবে। কিন্তু দ্বিতীয় পদক্ষেপ যে সবাইকে এভাবে চমকে দেবে ভাবতেও পারেননি তিনি।

সেইদিনই রাতে খাওয়ার সময় একটা প্যাকেট এলো, পাঠিয়েছেন প্রতিবেশী মিসেস হক। চিঠিটা পড়ছেন রহমান খালু, সেই ফাঁকে প্যাকেট খুলে চমকে উঠল কাঞ্চন।

'আরে, এই বইটাই তো সালামকে কিনে দিয়েছিলেন আসাদ মামা!'

'শালার কপাল!' মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল সালামের।

'গাল দিতে হয় না,' বকা দিল ছোট্ট সুজন।

চোখ তুলে সালামকে একবার দেখে নিয়ে আবার চিঠিতে মন দিলেন খালু। আবার যখন চোখ তুললেন, খালুর চোখের দিকে চোখ তুলে চাইতে পারল না সালাম। মাথা নিচু করে নিচের ঠোঁট কামড়াচ্ছে। ক্রমে লাল হয়ে উঠছে মুখটা লজ্জায়।

'কি এটা?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন জুলিখালা।

'এটা নিয়ে পরে একান্তে আলোচনা করা উচিত ছিল, কিন্তু হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছে কাঞ্চন, কাজেই কথাবার্তা এখুনি সেরে নিতে হচ্ছে।' বলার ভঙ্গিটা একটু কঠোর, রেগে গেলে এই গলায় কথা বলেন রহমান খালু।

'চিঠি দিয়েছেন মিসেস হক। সালামের কাছ থেকে গত শনিবার একশো টাকায় বইটা কিনেছে তার ছেলে রাসেল। তিনি পাতা উল্টে

দেখেছেন বইটার আসল দাম বারোশো টাকা। কোথাও কোন ভুল হয়েছে মনে করে তিনি বইটা পাঠিয়েছেন আমাদের কাছে। তুমি এটা বিক্রি করেছ, সালাম?'

'হ, খালু।'

'কেন?'

'টাকার দরকার আছিল।' ক্রমে সালামের গলায় আগের সেই কর্কশ ভাবটা ফিরে আসছে, লক্ষ করল সবাই।

'কিজন্যে?'

'একজনের পাওনা শোধ করতে।'

'কার কাছে দেনা ছিলে তুমি?'

'দিলুর কাছে।' মাথাটা টেবিল ছোঁয়ার উপক্রম করেছে।

'জীবনে একটা আধলাও ধার নেয়নি ও আমার কাছ থেকে!' বলে উঠল বিস্মিত দিলু। ওর চোখের দৃষ্টিতে ভয় এসে মিশল বিস্ময়ের সঙ্গে, কারণ বুঝে ফেলেছে ও এবার কি আসছে। সালাম ওর পরম শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইদানীং।

'মনে হচ্ছে, ও-ই নিয়েছিল দিলুর টাকা,' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সালাউদ্দীন আলী। কিছুটা দেনা-পাওনা রয়ে গেছে ওর সালামের সঙ্গে, ভোলেনি সে ওর সেদিনের আচরণ।

‘কি করলে, সালাম?’ প্রায় ফুঁপিয়ে উঠল তুহীন। ‘আমাকে বাঁচাতে গিয়ে...অথচ তুমি জান...’

‘সোজা কথায় জবাব দাও,’ সালামের দিকে চাইলেন খালু ভুরু কুঁচকে। ‘গোলাঘরে তুমিই টাকাগুলো রেখেছ?’

‘হ, আমি রাখছি।’ ডক্টর রহমানের চোখে চোখ রেখে উত্তর দিল সালাম।

থতমত খেয়ে গেল টেবিলের সবাই। মৃদু গুঞ্জন উঠল। খটাশ করে দুধের বাটি নামিয়ে রাখল দিলু। ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন জুলিখালা। দুইহাতে মুখ ঢাকল সালাম। কিন্তু পরক্ষণেই বুক টান করে আগের সেই বেপরোয়া ভঙ্গি নিল। বলল, ‘হ, আমিই করছি কাজটা। যা শাস্তি দেন মাথা পাইতা লমু, কিন্তু এই নিয়া আর একটা কথাও কমু না।’

‘তুমি দুঃখিত, এই কথাটাও বলবে না?’ জানতে চাইলেন খালু।

‘আমি দুক্ষিত না।’

‘না চাইলেও আমি ওকে ক্ষমা করতে রাজি আছি,’ বলল দিলু। সালামের এই অসম্মান কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না ও।

‘কে চাইছে ক্ষমা? ক্ষমা করার কুনো দরকার নাই,’ কর্কশ কণ্ঠে বলল সালাম।

‘একান্তে ভাবনা-চিন্তার সুযোগ পেলে তোমার মত পাল্টাতেও পারে,’ বললেন ডক্টর রহমান। ‘এক্ষুণি তোমাকে কিছু বলব না। কতটা

অবাক আর হতাশ হয়েছি সেকথা একান্তে জানাব আমি তোমার কামরায় গিয়ে।'

'কুনো লাভ নাই,' বলল সালাম। 'আর একটা কথাও বাইর হইব না আমার মুখ দিয়া।' কথাটা বলে আধ-খাওয়া প্লেট রেখে উঠে চলে গেল ও বাইরে।

ও থাকলে হয়তো ভালই করত। সবাইকে সহানুভূতিশীল দেখে হয়তো ও ক্ষমা চেয়ে ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি করে ফেলতে পারত। কাজটা যে ওর, এটা জেনে কেউই সন্তুষ্ট হতে পারেনি। কারণ, দোষত্রুটি থাকলেও ওর কর্কশ খোলসের ভিতরে এমন কিছু মানবিক গুণের সন্ধান পেয়েছে ওরা যার জন্যে ওকে ভাল না বেসে কোন উপায় নেই।

সবচেয়ে দুঃখ পেয়েছেন জুলিখালা। সালামকে তিনিই গড়ে পিটে মানুষ করে তুলছিলেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, চুরি তো করেইছে, মিথ্যা কথা বলে নিরীহ, নিষ্পাপ আরেকজনকে এত ভোগান্তির মধ্যে ফেলেছে, তার ওপর বিবেকের দংশন সহ্য করতে না পেরে টাকাটা গোপনে ফেরত দেয়ার মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে ওর কাপুরুষতা। সবচেয়ে আপত্তিকর হচ্ছে ওর একটি কথাও বলতে না চাওয়া, ক্ষমা না চাওয়া, দুঃখ প্রকাশ না করা।

দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে, নিয়মিত লেখাপড়া, কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে সালাম; কিন্তু গম্ভীর, চুপচাপ, উদ্ধত। ওকে ঘৃণা, অবহেলা বা একঘরে

করে শাস্তি দেয়ার কোন সুযোগই দেয়নি ও ছেলেদের; বরং নিজেই ওদের ভিড়তে দিচ্ছে না কাছে, সমবেদনা জানাতে এলেও না। অবসর সময় কাটাচ্ছে ও মাঠে-ময়দানেজঙ্গলে পশু-পাখি আর প্রজাপতির সঙ্গে।

'এরকম যদি আর কিছুদিন চলতে থাকে, তাহলে আবার পালাবে ছেলেটা,' বললেন একদিন রহমান খালু। বড় হতাশ হয়েছেন তিনি এই ছেলেটার ব্যাপারে। ঠিক যখন মনে হচ্ছিল লাইনে এসে গেছে ও, তখনই এই বিপর্যয়।

'হ্যাঁ,' বললেন জুলিখালা। 'মনে হচ্ছে আমাদের সব চেষ্টা বিফলে গেল, এই একটি ছেলের বেলাতেই হেরে গেলাম। আজকাল ও আমাকে এড়িয়ে চলে, কথা বলে না। আমি ধরে ফেললে এমন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, যেন ফাঁদে আটকে যাওয়া পশু।'

ছায়ার মত সেঁটে থাকে ওর সঙ্গে তুহীন। একমাত্র তুহীনকেই ও কাছে আসতে দেয়, তবে ওকেও বলে দিয়েছে, 'আমার কথা ভাইবো না। তোমার থেইকা সইয্য ক্ষমতা আমার বেশি!'

'তুমি আমার কথা ভেবে এই অপবাদ নিজের ওপর টেনে নিয়ে একা একা ঘুরে বেড়াও, আমি তোমাকে একটু সঙ্গও দিতে পারব না?'

'কে কইছে তোমার লেইগা এই কাম করছি? আমি চুরি করতে জানি না?' রহস্যময় হাসি হেসে সরে গেছে ও আরেক দিকে।

একদিন জঙ্গলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে সালাম আর তুহীন দেখল

একটা গাছে কয়েকজন ‘ওঠা-নামা’ খেলছে। মস্ত উঁচু একটা গাছে উঠে জমির সমান্তরাল মোটা একটা ডাল বেয়ে এগিয়ে যেতে হবে যতদূর সম্ভব; দেহের ওজনে নিচু হতে থাকবে ডালের আগার দিকটা। শেষ কিছুদূর এগোতে হবে ডাল ধরে ঝুলে। ওটা বাঁকা. হয়ে জমির কাছাকাছি এলেই লাফিয়ে নেমে আসতে হবে নিচে। মজার খেলা। একটু দূরে দাঁড়াল ওরা দেখবে বলে। গাজী ফরিদকে গাছ বেয়ে উঠতে দেখল ওরা, এবার ওর পালা। তুহীন ভাবল, এর ভারে কি এত মোটা ডালের আগা নুইবে?

যা ভেবেছিল! ঝুল দিল ঠিকই, কিন্তু সামান্য একটু বাঁকা হয়ে সেই অবস্থাতেই রয়ে গেল গাছটা, মাথা নোয়াল না। বিপজ্জনক ভঙ্গিতে ঝুলে রইল গাজী ফরিদ।

‘পিছিয়ে যাও!’ নিচ থেকে চেঁচিয়ে বলল সালাউদ্দীন, ‘পিছিয়ে যাও! নোয়াতে পারবে না ওটাকে!’

পিছিয়ে আসার চেষ্টা করল ফরিদ, কিন্তু ছোট ডালগুলোর জন্যে পারছে না। পা দিয়ে পেঁচিয়ে ধরার চেষ্টা করল ডালটাকে, কিন্তু সেটাও সম্ভর হচ্ছে না। আতঙ্কিত গলায় চেঁচিয়ে উঠল সে, ‘ধরো আমাকে! পড়ে যাচ্ছি, সালাউদ্দীন! বাঁচাও! ছুটে যাচ্ছে আমার হাত!’

‘ওখান থেকে পড়লে স্রেফ মারা যাবে!’ বলল সালাউদ্দীন। কি করবে বুঝতে পারছে না।

‘বাচাও!’ আবার চেঁচিয়ে উঠল ফরিদ।

‘খারাও, আইতাছি! আদামিনিট ঝুইলা থাকে!’ বলেই সড়সড় করে কাঠবিড়ালির মত গাছ বেয়ে উঠে গেল সালাম। কাছে গিয়ে দেখল থরথর করে কাঁপছে গাজী ফরিদের হাত, ভয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে দু’চোখ। ‘হাত ছাইরো না, গাজী! খবরদার!’

‘দুইজনেই পড়বে তোমরা!’ নিচে দাঁড়িয়ে উত্তেজনায় ছটফট করছে সালাউদ্দীন।

কি করবে বুঝতে না পেরে নিচে দাঁড়িয়ে লুফে নেয়ার ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে রেখেছে দিশেহারা তুহীন।

‘সেইটাই চাইতাছি,’ শান্ত গলায় বলল সালাম। ‘অই, তুহীন, সইরা যাও নিচ থেইকা।’

সালামকে দেখে আশার আলো জ্বলে উঠেছে গাজী ফরিদের দু’চোখে। আর একটু এগোতেই বাড়তি ওজনের কারণে মাথা নোয়াতে শুরু করল বেয়াড়া ডালটা। গাজীর পাশে ঝুলে পড়ল সালামও। নেমে আসছে ওরা, পাঁচ-সাত ফুট থাকতেই হাত ছেড়ে লাফ দিয়ে নামল গাজী নিরাপদে। সালামও লাফ দিতে যাবে, এমন সময় ওজনটা অর্ধেক হয়ে যাওয়ায় ঝাঁকি খেল ডাল। সালামের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে স্প্রিঙের মত সোজা হয়ে গেল সেটা। বেকায়দা ভঙ্গিতে দড়াম করে মাটিতে আছড়ে পড়ল সালাম। সবাই ছুটে এলো।

‘না, বেশি লাগে নাই; ঠিক হইয়া যাইব অক্ষণেই,’ বলে বাঁকা হয়ে উঠে বসল ও। বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে চাইল চারদিকে, মুখ রক্তশূন্য। কোনমতে উঠে দাঁড়াল। টলছে।

‘একটু জিরিয়ে নাও আগে,’ বলল উদ্বিগ্ন তুহীন, কিন্তু মাথা নাড়ল সালাম।

‘তোমার তুলনা হয় না, সালাম! অনেক-অনেক ধন্যবাদ!’ গলাটা কাঁপছে কৃতজ্ঞ গাজী ফরিদের। ‘সাহস আছে তোমার! তুমি না থাকলে আজ কী যে হতো!’

‘আরে, না,’ লজ্জিত হাসি সালামের মুখে। ‘এইটা কিছু না।’

‘নিশ্চয়ই কিছু!’ জোর দিয়ে বলল সালাউদ্দীন আলী। ‘বিরাট কিছু। এজন্যে তোমার সঙ্গে হাত মেলাব আমি, যদিও তুমি একটা-’ চট্ করে মুখে চলে আসা শব্দটা গিলে নিল ও, তারপর হাতটা বাড়িয়ে দিল সামনে। ওর ধারণা হাত বাড়িয়ে দিয়ে ধন্য করছে চোর সালামকে।

‘কিন্তু আমি কুনও মুরগীর লগে হাত মিলাই না,’ বলে পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল সালাম।

থতমত খেয়ে হাত ফিরিয়ে নিল গাজী ফরিদ।

পরদিন হাসিমুখে ক্লাসে ঢুকলেন রহমান খালু। সবাই অবাক। আজ অনেকদিন তাঁর মুখে এক ফোঁটা হাসি দেখেনি ছেলেরা। নিশ্চয়ই আজ

ভাল কিছু ঘটেছে। সবাই উৎসুক হলো শুনবে বলে।

সোজা গিয়ে সালামের সামনে দাঁড়ালেন তিনি। ওর দুই কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'এতদিনে বুঝলাম, ছেলেটা আমার এরকম হয়ে গেল কেন। তোমাকেই মানায় যা করেছ! আমার অন্তর থেকে দোয়া রইল তোমার জন্যে-অনেক বড় হবে তুমি, সালাম। তবে মিথ্যে বলা ঠিক হয়নি, কোনও অবস্থাতেই ঠিক না, বন্ধুর জন্যে বলা হলেও না।'

'কি বলছেন, খালু?' জিজ্ঞেস করল তুহীন। 'কিছুই তো বুঝতে পারছি না!'

'তাহলে? তাহলে কে নিয়েছিল?' একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল ক্লাসের সবাই।

একটা খালি সিটের দিকে আঙুল তাক করলেন খালু। সবাই চাইল সেদিকে। এতই অবাক হয়েছে যে এক মিনিটের জন্যে জবান বন্ধ হয়ে গেল ওদের।

'খুব ভোরে আজ বাড়ি চলে গেছে গাজী ফরিদ। একটা চিঠি লিখে আমার দরজার হাতলে বেঁধে রেখে গেছে ও। এই একটু আগে পেলাম।' নিজে আরেকবার ওর ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে জোরে পড়ে শোনালেন সবাইকে:

টাকাগুলো আমিই নিয়েছিলাম। গোলাঘরের পিছন থেকে একটা

ফাটলে চোখ রেখে আমি দেখেছিলাম দিলু কোথায় রাখল ওগুলো। বার কয়েক চেষ্টা করেও বলতে পারিনি ভয়ে। সালাম সাহসী ছেলে, তুহীনকে মিথ্যা অভিযোগ থেকে বাঁচাতে নিজের কাঁধে তুলে নিল দোষটা। তারপর যখন আমার বিপদে নিজের প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে সাহায্য করল, তখন থেকে মরমে মরে যাচ্ছি।

ওগুলো খরচ করিনি আমি। আমার খাটের পায়ের দিকে তোশকের নিচে গোঁজা আছে। যা করেছি সেজন্যে আমি দুঃখিত। বাড়ি চললাম, আর কোনদিন হয়তো ফিরে আসব না। খালু, পারলে ক্ষমা করবেন। আর আমার সব জিনিস সালামকে দিয়ে দিলে খুশি হব।

গাজী ফরিদ।

চিঠিটা পড়া শেষ হলে ডেস্ক ছেড়ে রহমান খালুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল সালাম। চট্ করে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে সোজা হলো। 'আমারে মাফ কইরা দেন, খালু। আসলে বেকসুর তুহীনরে সকলে মিলা যা শাস্তি দিল, ওর বুকটা ভাইঙ্গা যাইতে দেইখা এইটা না কইরা আর উপায় ছিল না আমার।'

চট্ করে ওর মাথায় হাত রাখলেন রহমান খালু। 'বুঝেছি আমি। নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে মিথ্যে বলনি তুমি। সেইজন্যেই তোমাকে মাফ করে দিতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।'

আবার একবার রহমান খালুর পা ছুঁয়ে হাসিমুখে নিজের সিটে

ফিরে এলো সালাম।

চিকন একটা গলা শোনা গেল স্পষ্ট। ভাইয়ের কানে কানে বলছে, ‘দেখলে? আমি বলেছিলাম না তুহীন টাকা নেয়নি? এখন প্রমাণ হলো?’

কৃতজ্ঞ চিত্তে মেয়েটির দিকে চেয়ে হাসল তুহীন।

একা কাঞ্চন নয়, সালাম ছাড়া বাকি সবাই লজ্জায় মাথা নিচু করল কথাটা শুনে। সবাই মনে মনে স্থির করল, নরম মনের শিল্পী ছেলেটার বুকে জমা ক্ষোভ মুছে দিতে হবে যেমন করে হোক।

আট

নির্বিবাদে কেটে গেল কয়েক মাস। বর্ষা এসে চলে গেছে। এখন শরতও প্রায় শেষ।

ফিরে এসেছে গাজী ফরিদ। সবাই ওকে মেনেও নিয়েছে। কারণ, অনুতপ্তকে মেনে নেয়াই ইসকুল বাড়ির নিয়ম। তবে ওর সঙ্গে এখনও আগের মত সহজ হতে পারেনি কেউ।

দিলু একদিন বুড়ো বটগাছের ডালে বসে গোপনে তুহীনকে জানাল, ওরা সবাই ঠিক করেছে, টাকা চুরির ব্যাপারে এই যে এত ভুল বোঝাবুঝি হলো, আর বন্ধুর জন্যে ত্যাগ স্বীকার করে সালাম যে বিরাট মহত্ত্ব দেখাল; তার জন্যে সবাই মিলে ওকে পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করবে। এমন দামী কিছু দেবে, যেটা ওর কাজে লাগবে চিরকাল।

‘কেমন লাগল তোমার আইডিয়াটা?’

‘দারুণ! খুব ভাল হবে!’ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তুহীনের মুখটা।

‘বলো তো, কী দেব বলে স্থির করেছি আমরা?’

‘প্রজাপতি ধরার নেট না হলেই ভাল হয়,’ বলল তুহীন। ‘একটা নেট ওর দরকার। আমি ভাবছি আমি কিনে দেব ওটা। তোমরা কি দেবে ঠিক করলে?’

‘মাইক্রোস্কোপ!’ চকচক করছে দিলুর চোখ, ‘বুঝছেন হুজুর? আস্ত

একটা দামী মাইক্রোস্কোপ! খালি চোখে দেখা যায় না, এমন সব জীবাণু দেখা যাবে ওটা দিয়ে। দারুণ হবে না?'

'তুলনাহীন! শুনে খুব ভাল লাগছে আমার। কিন্তু ও-জিনিসের অনেক দাম না?'

'নিশ্চয়ই! সবাই মিলে দামী জিনিসই তো দিতে চাই। আমি আমার পাঁচশো টাকা চাঁদা দিচ্ছি।'

'অ্যাঁ! পুরো পাঁচশো টাকা?'

'তবে আর বলছি কি?'

'বিরাট মনের মানুষ আসলে তুমি, দিলু!' নিখাদ প্রশংসার দৃষ্টিতে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল ওকে তুহীন।

'মানে, ওই চুরিটার ব্যাপারে এতই দুঃখ পেয়েছিলাম যে মনটাই আমার ছোট হয়ে গেছিল। বিরক্তি এসে গেছে এখন টাকা-পয়সার ওপর, ভাবছি আর কোনদিন টাকা জমাতে যাব না, হাতে এলেই কোনও ভাল কাজে খরচ করে ফেলব। টাকাই যদি না থাকে তাহলে কেউ হিংসাও করতে পারবে না, চুরিও করতে পারবে না; আর আমিও একে-ওকে সন্দেহ করে নিজেকে নিজে ছোট করতে পারব না।'

'রহমান খালু রাগ করবেন না?'

'নাহ! আমি বলতেই খুশি হয়ে বললেন, এর চেয়ে ভাল আর কিছুই হতে পারে না। টাকা কিভাবে খরচ করলে মানুষের উপকার হবে, আমি

চাইলে তিনি সেই পরামর্শ দেবেন আমাকে।'

'আমিও তাহলে বেহালা না কিনে আমার জমানো টাকাটা খালুকে জিজ্ঞেস করে ভাল কোনও কাজে খরচ করব,' দিলুর দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঘোষণা দিল তুহীন। 'আমার অত টাকা নেই, কিন্তু সামান্য উপকার করতে পারলেও তো অনেক, তাই না?'

হেমন্ত এসে গেল। ছেলেরা যেমন দেহমনে কলকলিয়ে বেড়ে উঠছে, সুযোগ্য প্রিন্সিপালের নির্দেশনায় আশাতীত উন্নতি ঘটাচ্ছে নিজ-নিজ মেধার; সময়ও তেমনি বসে নেই, ইতোমধ্যে খেতের ফসল সব পাকিয়ে দিয়েছে।

গাজী আর সালাউদ্দীন যৌথভাবে আলু বুনেছিল। ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় বারো মন আলু বিক্রি করেছে ওরা জুলিখালার কাছে, ন্যায্য দামে। তপন আর খলিল বুনেছিল ভুট্টা। বাম্পার ফলন হয়েছে এবার ভুট্টার। প্রতিটি দানা এসে উঠেছে জুলিখালার ভাড়ারে। একটা পয়সাও দেয়া যায়নি ওদের, স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে ওরাঃ সারা জীবন ভুট্টা ফলিয়েও তো আমরা চাচা-চাচির ঋণ শোধ করতে পারব না। পয়সা নেয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

প্রচুর মটরশুটি ফলেছে তুহীনের জমিতে। শুকনো খোসা ছাড়িয়ে বীজ বের করার অভিনব বুদ্ধি দিয়েছেন ওকে জুলিখালা। গোলাঘরের

মেঝেতে ওগুলো বিছিয়ে দিয়ে ওর বেহালার বাজনার তালে তালে ছেলেদের তাণ্ডবনৃত্যের আয়োজন করেছে ও। নাচের চোটেই বেরিয়ে এসেছে সব বিচি।

শিম লাগিয়েছিল দিলু, সময়মত পানি না দেয়ায় খরার কবলে পড়ে মারা গেছে পুরো ফসল। তাতে অবশ্য বিন্দুমাত্র না দমে সময় পার হয়ে গেলেও ছোলা বুনেছে ও। বেশির ভাগ দানা খেয়ে নিল পাখি, বাকি যে কটা থেকে গাছ উঠল, ঠিকমত গভীর করে বোনা হয়নি বলে শুয়ে পড়ল একটু বাতাসেই। অবশেষে ঘোষণা দিয়েছে: আগামী বছর সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে ও ওর জমিতে আঙুর ফলিয়ে।

কাঞ্চন বুনেছিল লেটুস আর শালগম। গোটা গ্রীষ্মকাল ওর ফলানো লেটুসের সালাদ খেয়েছে ইসকুল বাড়ির সবাই, তাছাড়াও প্রতি শুক্রবার নানীর জন্যে একগাদা করে তুলে দিয়েছে ও জুলিখালার গাড়িতে। আর গোটা শরৎ আর হেমন্ত জুড়ে চলছে শালগমের মহোৎসব, খাও যার যত খুশি। নানার জন্যেও একঝুড়ি পাঠিয়েছে ও ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে।

মণি ওর জমিতে লাগিয়েছিল হরেক রকম ফুলের গাছ। ফাল্গুন থেকে সেই যে শুরু হয়েছে আশ্বিনেও ফুলের কোনও কমতি নেই। কারণ রুস্তম আলীর পরামর্শে যে ঋতুতে যেটা দরকার তারই বীজ বুনেছে সে। ইসকুল বাড়ির প্রতিটা ঘর ওর ফুলের সুবাসে ভরপুর ছিল সারাটা বছর। প্রতিবেশীরাও ওর প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হয়নি; আশপাশের পঁচিশ-ত্রিশ ঘরের একজনও বলতে পারবে না এ-বছর অন্তত দুটো ফুলের তোড়া

পায়নি এই মিষ্টি, ছোট্ট ভদ্রমহিলার কাছ থেকে।

রাশেদ, অমিত আর সুজন ওদের জমিগুলোতে খেয়াল খুশি মত খেলার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। ওরা তিনজন জমির পিছনে যে পরিমাণ শ্রম ব্যয় করেছে, বড়রা তার চারভাগের একভাগও করেছে কি না সন্দেহ। কিন্তু বাস্তবজ্ঞানের অভাবে ফসল পেয়েছে ওরা সামান্যই। গাজর লাগিয়েছিল রাশেদ আর অমিত, কিন্তু ধৈর্য ধরতে না পেরে কিছুদিন পর-পরই গোপনে উপড়ে তুলে দেখেছে গাজর কতবড় হলো, তারপর যখন দেখেছে রুস্তম আলী ঠিকই বলেছিল-দেরি আছে এখনও, তখন আবার পুতে রেখেছে কেউ দেখে ফেলার আগেই। ফলে সব ফক্কা।

সুজন লাগিয়েছিল চালকুমড়ো, গণনায় পাওয়া গেছে মোট পাঁচটা, কিন্তু চারটে এতই ছোট আর ত্যাড়াব্যাকা যে ওগুলোকে ধর্তব্যের বাইরে রাখাই উচিত। তবে বাকি একটা হয়েছে দেখার মত-মস্ত বিশাল। রাশেদ আর অমিত ওর ওপর পাশাপাশি চড়ে বসলেও সুজনের জন্যে জায়গা থাকবে বসার।

বেচারা মুন্না শশা লাগিয়েছিল ওর জমিতে। কলকলিয়ে বাড়ছিল গাছ, কিন্তু আগাছা তুলতে গিয়ে ভুল করে গাছগুলো তুলে ফেলেছে ও, আগাছা রয়ে গেছে যেমন ছিল তেমনি। মিনিট দশেক খুবই আফসোস করেছে ও, তারপর সব ভুলে গোটা কয়েক চকচকে বোতাম বুনেছে জমিতে। ওর ধারণা, একটা বোতাম গাছ বাঁচাতে পারলেই অসংখ্য বোতাম বেচে ও দিলুর মতই বড়লোক হয়ে যাবে। কিছুদিন পরে কি

বুনেছিল ভুলে গিয়ে আবার লণ্ডভণ্ড করেছে জমিটাকে। ফসল তোলার সময় এলে ওর জমিতে শুকনো একটা ডাল ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যেত না, আসিয়া যদি মায়া পরবশ হয়ে ওই ডালে গোটা ছয়েক কমলা ঝুলিয়ে না দিত। কমলা পেয়ে মহানন্দে নাচতে নাচতে ছুটল ও আসিয়াকে দেবে বলে।

অনীক খান তরমুজ ফলিয়েছে এবার। হয়েছেও অনেক। তবে যত না বিলিয়েছে তার চেয়ে খেয়েছে বেশি। খেতে খেতে অসুস্থ হয়ে গেছে, তাও থামতে পারেনি।

সালাম ফসল বোনার সুযোগ পায়নি এবার পায়ের কারণে। সেরে যখন উঠল তখন আর সময় ছিল না। তাই বলে বসে থাকেনি ও, রুস্তম আলীকে সাহায্য করেছে মাঠে, কাঠ ফেড়ে দিয়েছে আসিয়াকে, বাড়ির সামনের লনটাকে নিয়মিত ঘাস ছেঁটে আর চারপাশে ঝাউগাছ লাগিয়ে সুন্দর করে তুলেছে।

ফসল তোলার সময় আর সবার মত দেখাবার কিছুই নেই ওর, কিন্তু তাই বলে দমবার পাত্র সে নয়। জঙ্গল থেকে প্রচুর কাঠবাদাম সংগ্রহ করে আনল ও, তুলে এনে দিল নানান জাতের কচু।

ছেলেদের ফসলে প্রায় ভর্তি হয়ে গেল মস্ত চিলেকোঠা। কেউ কেউ শুকাবার জন্যে ছাদের কিছুটা দখল করে রোদে দিয়েছে তাদের গম, ভুট্টা, মরিচ, তিল বা সরষে। চারদিকে মিষ্টি একটা সন্তুষ্টির সুবাস।

নয়

পৌষ এসে গেল। পরীক্ষা শেষ। খাতা দেখাও শেষ হয়ে গেছে। ফলাফল দেখে দারুণ খুশি খালু ও জুলিখালা। সারাটা বছর ওঁরা যা চাষ করলেন, তার ফলন যে এত চমৎকার হবে ভাবতেই পারেননি। দেখা গেল আবাসিক ছাত্ররা বাইরে থেকে আসা ছেলেমেয়েদের চেয়ে প্রায় প্রতিটি বিষয়েই ভাল করেছে। খলিল ভাইয়ের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে খবরটা। ইসকুল বাড়ির সবাই খুশি। তবে কারও কারও মন খারাপ ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সাথে বেশ কিছুদিন দেখা হবে না বলে। আগামী কাল বছরের শেষ ক্লাস-প্রগ্রেস রিপোর্ট দেয়া হবে সবাইকে। তার পরদিন থেকে শীতের ছুটি। ছুটিতে অর্ধেকের বেশি ছেলে বাড়ি চলে যাবে, আবার আগামী বছর স্কুল খুললে আসবে ফিরে।

লেখাপড়ার চাপ নেই, তাই সন্ধেটা আর কাটতেই চায় না। ছোটরা শুয়ে পড়তেই বড়রা ভাবতে শুরু করল, কি করা যায়। বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে, খেজুরের রস খেতে বেরোবে ওরা রাত দশটার পর, এই মাঝের সময়টা 'কুমির, কুমির, জলে নেমেছি', 'ক্যারম', 'লুডু', 'কানামাছি ভোঁ-ভোঁ, যারে পাবি তারে ছোঁ', 'কাঠকুড়ালি', 'এক্কা দোক্কা'-এই রকম নানান খেলা খেলল ওরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে-কিন্তু আজ আর কোনও খেলাই জমছে না। মন ভাল নেই কারও, একটুতেই ঝগড়া বেধে যাচ্ছে।

উদ্ধার করল খলিল ভাই। 'এসো, একটা আইন পাস করি: এখন

থেকে আগামী একঘণ্টার মধ্যে যে এই হলরুমে ঢুকবে, সে যে-ই হোক, আমাদেরকে একটা গল্প শোনাতে হবে তার! কোনও ওজর আপত্তি চলবে না। ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ, খুব মজা হবে!' মস্ত এক গামলায় পেঁয়াজ, মরিচ, আদা, লবণ আর খাঁটি সরষের তেল দিয়ে একগাদা মুড়ি মাখাতে মাখাতে বলল মণি। 'আমার মনে হয় প্রথম ধরা পড়বে খালু!'

সবাই হৈ-হৈ করে উঠল। সত্যিই মজা হবে। কে যে প্রথম ফাঁদে পড়ে সেটা দেখাও একটা দারুণ মজা।

দশ মিনিট যাওয়ার আগেই গজফিতে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন জুলিখালা, মণির জন্যে একটা জামা বানাচ্ছেন, ওর মাপ নেবেন।ঘরের মাঝামাঝি আসার সময় দিল ওরা, তারপর ঝট্ করে ঘিরে ধরল। আনকোরা নতুন গল্প হতে হবে শুনে কিছুটা চিন্তিত হলেও আইন মেনে নিয়ে বসে পড়লেন খালা।

'আমিই ধরা পড়লাম প্রথম?'

'হ্যাঁ, আমাদের পয়লা শিকার,' বলল ভোটকু।

মুড়ির গামলায় হাত চালালেন জুলিখালা। 'কিছুই তো মনে আসছে না। বলো দেখি কিসের গল্প শুনতে চাও?'

'ছেলেদের,' চেঁচিয়ে উঠল ছেলেরা। 'সত্যি ঘটনা হতে হবে।'

'সঙ্গে এক-আধ জন মেয়ে থাকলে আরও ভাল হয়।' আবদার

মণির।

‘আর যদি কিছু খাওয়া-দাওয়ার বর্ণনা থাকে...’ জিভ টানল অনেক খান।

মাথা ঝাঁকালেন জুলিখালা। ‘বেশ।’

‘নাম কি গল্পের?’ জানতে চাইল কাঞ্চন।

‘সন্দেহভাজন।’

চট্ করে চোখ তুলে চাইল তুহীন।

‘ছোট্ট একটা শহরে নামকরা এক স্কুলের পাশে মেস চালাতেন এক বিধবা মহিলা। স্কুলের ছাত্রদের জন্যে খুলেছিলেন ওটা মিসেস জামান। ছোট-বড় মিলিয়ে দশ-বারোটা ছেলে থাকত ওই মেসে। শান্তনু বলে একটা ছেলে ছিল তাদের মধ্যে, এমনিতে খারাপ না, কিন্তু মাঝে মাঝে একটু-আধটু মিথ্যে কথা বলত। একদিন পাশের বাড়ির মহিলা গোটা দুই নারকেল পাঠালেন। সবাইকে চমকে দেবেন মনে করে বিধবা ওগুলো কুরে চমৎকার, সুস্বাদু পাটিসাপটা পিঠে বানিয়ে তুলে রাখলেন রান্নাঘরের দেয়ালআলমারিতে। রাতে খেতে বসল সবাই। খাওয়া যখন প্রায় শেষ, তখন মুচকি হেসে রান্নাঘরে গেলেন মহিলা ওগুলো আনতে, কিন্তু ফিরে যখন এলেন, মুখটা গম্ভীর, ফ্যাকাসে। বলো দেখি কেন?’

‘সব গেছে ভোটুকুর পেটে!’ বলল সালাউদ্দীন আলী।

‘এহ!’ আপত্তি জানাল অনীক, ‘আমি চোর না!’

‘চুপ করো, গল্প শুনতে দাও!’ ধমক দিল তপন।

‘সবগুলোই সাজানো রয়েছে থালায়, কিন্তু কে যেন ভেতরে ঠাসা নারকেলের পুর সব খেয়ে নিয়েছে।’ থামলেন জুলিখালা।

‘নিশ্চই অতিচালাক কেউ করেছে কাজটা!’ বলেই দিলুর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল সালাউদ্দীন। একগাদা ঝালমুড়ি মুখে পোরায় জবাব দিতে পারছে না দিলু, মুখের সব কোঁত করে গিলে নামানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু সে সুযোগ পাওয়া গেল না। আবার গল্প ধরলেন জুলিখালা।

‘মহিলা যখন ব্যাপারটা খুলে বললেন, থালা এনে দেখালেন, তখন দুঃখ পেল ওরা; তবে সবাই একবাক্যে বলল এ-ব্যাপারে কেউ কিছু জানে না। শান্তনু বললঃ হয়তো ইদুর বা বিড়ালে খেয়েছে। কিন্তু মহিলা বললেন, কাজটা মানুষের; ইদুর-বেড়ালের সাধ্য নেই এভাবে ভেতর থেকে নারকেলের পুর বের করে লোপাট করার। কেউ একজন চুরি করে খেয়েছে ওগুলো, এখন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মিথ্যা-মনটা খারাপ হয়ে গেল মহিলার।’

‘খাওয়া সেরে সবাই ঘুমাতে গেল। অনেক রাতে গোঙানির শব্দে জেগে গেলেন মিসেস জামান। উঠে গিয়ে দেখলেন প্রচণ্ড পেট ব্যথায় কাতরাচ্ছে আর ছটফট করছে শান্তনু। বোঝা গেল, এমন কিছু খেয়েছে যেটা গোলমাল করছে পেটে গিয়ে। ডাক্তার ডাকার জন্য লোক পাঠাতে যাচ্ছিলেন মহিলা, কিন্তু ডাক্তার কথা শুনে ভয় পেয়ে কাতর ভঙ্গিতে বলল

ছেলেটা: নারকেল! মরার আগে স্বীকার করে যাচ্ছি-আমিই খেয়েছি সব। মহিলা বললেন: তাই যদি হয়, তাহলে এত রাতে আর ডাক্তার ডাকার দরকার নেই; ইমেটিক দিচ্ছি, কিছুক্ষণের মধ্যেই আরাম হবে।'

'ওষুধ খেয়ে বমি-টমি করে সকাল নাগাদ সেরে উঠল শান্তনু, মহিলাকে অনেক করে অনুরোধ করল যেন কাউকে কিছু না বলেন। রাজি হলেন তিনি। কিন্তু কাজের মেয়েটা বলে দিল সবাইকে। তারপর থেকে অনেক দিন পর্যন্ত জ্বালাতন করল ওকে ছেলেরা: কেউ ডাকে নারকেল, কেউ ডাকে পাটিসাপ্টা বলে।'

'যেমন কর্ম তেমনি ফল,' বলল তপন।

'পাপ ঢাকা থাকে না,' নীতিবাক্য আওড়াল কাঞ্চন।

'ব্যস, এই শেষ?' জানতে চাইল গাজী ফরিদ।

'না। প্রথম অংশ শেষ। এরপর আরেকটা অংশ আছে,' বললেন জুলিখালা। 'সেটুকু আর একদিন শুনো, কেমন?'

হৈ-হৈ করে উঠল সবাই, তা চলবে না, পুরো গল্প শেষ করতে হবে। অগত্যা আবার শুরু করলেন জুলিখালা।

'কিছুদিন পর এক শুক্রবার দুপুরে চেনাজানা এক ফেরিওয়ালা এলো। গাঁটরি খুলে পসরা সাজিয়ে বসল ছেলেদের সামনে। ছেলেরা এটা-ওটা কিনল, কেউ পকেট-চিরুণী, কেউ রুমাল, কেউ নেইল কাটার, কেউ বা মানিব্যাগ। চাকুগুলোর মধ্যে চার ফলার একটা সাদা হাতলের

চাকু বারবার হাতে তুলে নেড়েচেড়ে দেখল শান্তনু, কেনার খুবই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু হলো না; নিজের সব টাকা শেষ, কারও কাছে ধারও পাওয়া গেল না। পসরা গুটিয়ে নেয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফেরত দিল ও চাকুটা।'

'পরদিনই ফিরে এলো ফেরিওয়ালা। বলল, সাদা হাতলের দামী ছুরিটা পাচ্ছে না ওর পোটলায়, হয়তো ভুলে ফেলে গেছে এখানে, তাই খোঁজ নিতে এসেছে। খোজাখুঁজি করে দেখল সবাই, কোথাও পাওয়া গেল না। শান্তনুর দিকে ফিরে ফেরিওয়ালা বললঃ আমি গাটঠি গুটাইবার সময় এই পোলাটার হাতে ছিল চাকুটা। খোকা, তুমি ওইটা নামায়া রাখছিলা তো? সবার চোখে সন্দেহ দেখে ঘাবড়ে গেল শান্তনু, বারবার অস্বীকার করেও লাভ হলো না, ওকেই চোর ঠাউরেছে সবাই। শেষে ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠে ছুটে পালাল ঘর থেকে। ধার করে এনে মিসেস জামান দিয়ে দিলেন টাকাটা, অসন্তুষ্ট ফেরিওয়ালা চলে গেল গজর গজর করতে করতে।'

'শান্তনুই নিয়েছিল ওটা?' প্রশ্ন করল উদগ্রীব তুহীন।

'শুনে দেখো,' বলে আবার খেই ধরলেন জুলিখালা গল্পের।

'এইবার দ্বিগুণ হলো জ্বালাতনের মাত্রা। যখন তখন চেয়ে বসে ওটা ছেলেরা: তোমার সাদা হাতলের ছুরিটা একটু দাও তো, পাটিসাপ্টা, পেনসিলটা একটু চোখা করেই ফেরত দেব। অনেক চেষ্টা করেও

ছেলেদের এই খোঁচাখুঁচি বন্ধ করতে পারলেন না মহিলা। শেষকালে আর সহ্য করতে না পেরে ছেলেটা বাড়িতে চিঠি দিল, এই স্কুলে ও আর পড়বে না, যেন ওকে অন্য কোথাও ভর্তি করা হয়। ছেলেদের নিয়ে এই মুশকিল, কেউ মাটিতে পড়ে গেলে তাকে মারবে না ঠিকই, কিন্তু এমন টিটকারী দেবে, যাতে ও বাধ্য হয় ক্ষিপ্ত হয়ে একটা কিছু করে বসতে।'

'কথাটা ঠিক,' সায় দিল সালাম।

'হ্যাঁ,' বলল তুহীন, 'অবশ্য যদি সাহস থাকে তবেই।'

গাজী ফরিদ কিছু বলল না, কিন্তু স্বীকার করল মনে মনে, কারণ ও জানে, যতই এটা-ওটা ঘুষ দিক না কেন, ছেলেরা ওকে আগের চোখে দেখে না ওই একটিমাত্র কারণে।

'কই, বেচারা শান্তনুর কি হলো বলো, খালা,' অস্থির হয়ে পড়েছে মণি।

ওকে একহাতে জড়িয়ে ধরলেন খালা। বললেন, 'সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যাচ্ছে, কোনও নিষ্পত্তি হচ্ছে না ব্যাপারটার। কেউ কিছু প্রমাণ করতে পারছে না বটে, কিন্তু মুখে যা-তা বলছে। এদিকে বছর শেষ হয়ে আসছে বলে ওর মা-বাবা এখন স্কুল বদলাতে রাজি হলেন না। জীবনে আর কোনদিন একটাও মিথ্যে কথা বলবে না স্থির করল শান্তনু, চুরি করে নারকেলের পুর খাওয়ার জন্যে এতবার করে মাফ চাইল যে, মিসেস জামানের ধারণা হলো সত্যিই বোধহয় এই ছেলে নেয়নি ছুরিটা।'

‘দুই মাস পর আবার এলো সেই ফেরিওয়ালা। প্রথমেই বিশটা টাকা বের করে দিল মিসেস জামানের হাতে, বললঃ ছুরিটা পাইছি, আম্মা! বাস্কর চিপিতে পইরা আছিল। ইচ্চা করলে রাকতারেন। গতকাইল ঝারামুছা করতে গিয়া দেহি টপ্পর দা পরল পায়ের কাছে। হগ্গলতে মিলা খোকাটারে চোর বানাইলাম, অহন দেহি বালা করি নাই কামডা।’

জুলিখালাকে দেশী ভাষায় কথা বলতে শুনে হেসে উঠল সালাম। কিন্তু কিছু বলল না।

‘সব ছেলে ঘিরে ধরেছিল ফেরিওয়ালাকে। ওর কথা শুনে এমনই লজ্জা পেল যে একেকজন বিশ-ত্রিশবার করে মাফ চাইল শান্তনুর কাছে। চাকুটা ওকে উপহার দিলেন মিসেস জামান। আর ও-ও সেটা যত্ন করে রেখে দিল, যাতে ওটা দেখলেই মনে পড়ে যায় কী বিপদ ডেকে এনেছিল ওর ওই চুরি করে পুর খাওয়া।’

‘আরেকটা, আরেকটা!’ চেঁচিয়ে উঠল কয়েকটা কচিকণ্ঠ।

একটা গল্প শেষ হতে না হতে আরও একটা শোনানোর আবদার শুরু করতেই উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলেন জুলিখালা, এমনি সময় দেখা গেল ঘরে ঢুকছে সুজন, পিছনে টেনে আনছে বিছানার চাদরটা। সোজা এসে মায়ের সামনে ব্রেক কষল সে।

‘খুব হত্তগোল হথে শুনে আথলাম দেকতে, আবার আগুন লাগল কি না।’ মুড়ি দেখে খাবলা দিতে গেল।

‘দাঁড়াও, সুজন,’ বলল মণি, ‘মরিচ বেছে দিই।’

দুই হাতে দু’মুঠ মুড়ি নিয়ে মার কোলে ওঠার তাল করছে দেখে জুলিখালা বললেন, ‘এসে দেখলে যে সব ঠিক আছে, তোমার সাহায্যের কোনও দরকার নেই। এবার তাহলে যাও, সোজা বিছানায় গিয়ে ওঠো।’

কিন্তু ততক্ষণে উঠে পড়েছে সে কোলে, অবশ্য মায়ের সাহায্য নিয়েই, এখন সবার দিকে চেয়ে হাসছে সন্তুষ্টির হাসি।

‘এখানে যে ঢুকবে তাকেই একটা গল্প বলতে হবে,’ বলল খলিল ভাই, ‘কিন্তু তুমি তো গল্প জানো না, তোমার কেটে পড়াই উচিত, সুজন। চলো, তোমাকে আমি...’

‘আমি দানি!’ প্রতিবাদ করল সুজন। ‘কত গল্প থোনাই সুমনকে। ভালুক, তাদমামা, মৌমাথি-এথব অনে-ক গল্প।’

‘ঠিকাছে, একটা কইয়া ফালাও জলদি,’ বলল সালাম।

‘দাঁড়াও, এট্টু ভাবতে দাও,’ বলে ছাতের দিকে চোখ তুলে ভাবল ও দুই সেকেন্ড, তারপর ঘোষণা দিল, ‘হ্যাঁ, ভাবা হয়ে গেথে।’ মনে মনে গুছিয়ে নেয়ার ভঙ্গিতে চুপ করে থাকল সে কয়েক সেকেন্ড, তারপর শুরু করল, ‘অনে---ক দিন আগে এক মায়ের দুই লাখ থেলেমেয়ে থিল। একদিন মা দোতালায় দাবার থময়ে থোতো থেলেকে বলল: খবদার, উথানে দেয়ো না! কিন্তু ও গেল, আর একটা কুয়ায় পড়ে দুবে মরে গেল।’

‘ব্যস? গল্প শেষ?’ ওঠার ভঙ্গি নিয়ে জানতে চাইল খলিল ভাই। ‘খুব সুন্দর গল্প তো!’

‘না, না। আরও আথে,’ বলে ভুরু কুঁচকে রাখল ও কয়েক সেকেন্ড। কিন্তু আর কিছু খেলছে না মাথায়।

‘ছোট ছেলেটা কুয়ায় পড়ায় ওর মা কি করল?’ জিজ্ঞেস করলেন জুলিখালা।

‘ও, হ্যাঁ। মাটা ওকে কুয়া থেকে তুলে খবরের কাগদ দিয়ে মুড়ে নান্নাঘরের তাকে তুলে রাখল, শুকিয়ে গেলে পরের বথর খেতে বুনবে বলে।’

হা-হা করে হেসে উঠল সবাই। তাই দেখে আরও জোরে হেসে উঠল ও নিজেই। তারপর জিজ্ঞেস করল, ‘এবাত্তো আমি থাকতে পারব, তাই না, আম্মু?’

‘পারবে, তবে ওই দুইমুঠো মুড়ি শেষ না হওয়া পর্যন্ত,’ বললেন জুলিখালা, আশা করছেন দু’মিনিটে শেষ হয়ে যাবে সব।

কিন্তু পিচ্চি হলে কি হবে, হুঁশিয়ার লোক সুজন, প্রথমেই মুখে দিল একটা দানা। কিন্তু এভাবেও বেশিক্ষণ টিকতে পারল না। শেষ পাঁচটা দানা মুঠোয় ধরে ঢুলতে থাকল মায়ের কোলে বসে।

‘খালা, আর একটা গল্প!’ আবদার ধরল কাঞ্চন।

‘আজ আর না, সোনা। ওই শোনো, কার পায়ের আওয়াজ পাওয়া

যায়,' বলে উঠে পড়লেন তিনি ঘুমন্ত সুজনকে চাদরে জড়িয়ে নিয়ে।

ফাতেমা আপা ঢুকল, কিন্তু ছেলেরা ধরে ফেলার আগেই হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল আরেক দরজা দিয়ে। কিভাবে যেন বিপদের কথা জেনে গেছে আগেই।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, আপন মনে গুনগুন গান গাইতে গাইতে বাড়িতে ঢুকছেন রহমান খালু।

'এসো, সবাই মিলে জোরে হেসে উঠি,' চাপা গলায় বলল তপন মিত্র। 'তাহলে দোতালার সিঁড়ির দিকে না গিয়ে সোজা এই ঘরে আসবেন প্রথমে।'

অট্টহাসির মধ্যে দরজার ফাঁকে দেখা দিল একটা হাসিখুশি মুখ, ভেতরে ঢুকলেন রহমান খালু। ভুরু নাচালেন তিনি, 'এত হাসি কিসের?'

কয়েক পা এগোতে দিল তাকে ছেলেরা। তারপর চেঁচিয়ে উঠল খুশিতে। 'ধরা! আটকে গেছেন ফাঁদে! একটা গল্প না বলে ঘর থেকে বের হতে পারবেন না।' দরজা ভিড়িয়ে দিল একজন।

'ও! এটাই তাহলে এত হাসির কারণ!' চেয়ার টেনে বসলেন তিনি, বসেই শুরু করলেন:

'অনেকদিন আগে আমার শ্বশুর সাহেব, মানে, মণি-কাঞ্চনের নানা গরীব ছেলেমেয়েদের একটা অবৈতনিক স্কুলের জন্যে মানুষের দান

সংগ্রহ করবেন বলে বক্তৃতা দিতে গেছিলেন বড় এক শহরে। ভালই টাকা উঠল সেখানে, সব টাকা পকেটে নিয়ে খুশি মনে রওনা হলেন তিনি পরের শহরের উদ্দেশে। সেখানে যা টাকা উঠবে, সব নিয়ে পরদিন ফিরবেন নিজ শহরে। পরের শহরটা কাছেই, মাইল চারেক হবে দূরত্ব। রিক্সায় চেপে যাচ্ছেন তিনি।'

'দু'মাইল পেরিয়ে এসে রাস্তাটা খুব নির্জন মনে হলো তাঁর কাছে। দু'পাশে ঘন জঙ্গল। সাঁঝ ঘনিয়ে আসছে। ভাবলেন, এটা চমৎকার একটা ডাকাতির স্পট হতে পারে। ভাবতে না ভাবতেই জঙ্গল থেকে কর্কশ চেহারার এক লোক বেরিয়ে এসে হাঁটতে থাকল উনি যেদিকে যাচ্ছেন সেই দিকে। টাকার কথা ভেবে দুশ্চিন্তায় পড়লেন শ্বশুর সাহেব। একবার ভাবলেন রিক্সা ঘুরিয়ে নেবেন কি না। কিন্তু তাহলে আজ সন্ধ্যার মীটিং মিস হয়ে যায়। আর কিছুদূর এগিয়ে কাছ থেকে লোকটাকে দেখে নিজেকে বকা দিলেন তিনি। রুগ্ন, দুস্থ, গরীব লোকটা, পোশাকের অবস্থা খুবই খারাপ। কাছে গিয়ে থামাতে বললেন রিক্সাওয়ালাকে। নরম গলায় বললেন: তোমাকে তো খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে, বাবা উঠে এসো রিক্সায়। আমি সামনের শহরে যাচ্ছি, তোমার যেখানে খুশি নেমে যেয়ো।'

'চমকে গিয়ে অবাক হয়ে চাইল লোকটা, একটু ইতস্তত করল, তারপর উঠে বসল পাশে। শ্বশুর সাহেব তো অমায়িক ভঙ্গিতে গল্প করছেন আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকা লোকটার সঙ্গে; দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা, পরপর দু'বছর ফসল মার যাওয়ায় কী দুঃসহ জীবন যাপন

করছে গরীব মানুষরা বলে যাচ্ছেন তিনি। খুব কাছ থেকে দেখা বাস্তব অভিজ্ঞতার বর্ণনা ধীরে-ধীরে সহজ করে তুলল লোকটাকে। সে-ও হুঁ-হাঁ করতে শুরু করল খানিক পর। ভালমানুষটার আন্তরিকতা স্পর্শ করল ওকে, নিজের দুরবস্থার কথা বলে ফেলল গড়গড় করে। অসুখ, কাজ পায় না; বাড়িতে বৌ-ছেলেমেয়ে না খেয়ে অপেক্ষা করে ও রোজগার করে আনবে সেই আশায়, অথচ অতি সামান্য কিছু নিয়ে, অথবা খালিহাতে ফিরতে হয় ওকে প্রায় দিনই। আজ একটা পয়সাও রোজগার হয়নি।'

'ওর দুঃখের কথা শুনে সহানুভূতিতে একেবারে ফেটে যেতে চাইল দয়ালু মানুষটার বুক। লোকটার হাত চেপে ধরলেন তিনি, বললেন: আমাকে তোমার নাম-ঠিকানা দাও, আমি চেষ্টা করে দেখব তোমার একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়া যায় কি না। সামনের শহরের অনেক ভাল-ভাল লোককে আমি চিনি। আমি বললে আশা করি তোমার একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবেই।'

'নাম-ঠিকানা লেখার জন্যে মানিব্যাগটা বের করতে হলো, কাগজ আছে ওতে। টাকাগুলো দেখে ফেলল লোকটা। ভয় পেলেন তিনি, কিন্তু শান্ত গলায় বললেন: হ্যাঁ, আমি বক্তৃতা দিয়ে টাকা তুলছি গরীব ছেলেমেয়েদের স্কুল চালাবার জন্যে। বেশ অনেক টাকা আছে এখানে, কিন্তু আমার নিজের আছে মাত্র পঞ্চাশ টাকা। আসলে আমি নিজেও বড়লোক না, কায়ক্লেশে চলি। তুমি কিছু মনে কোরো না, বাবা, আমার

তরফ থেকে এই পঞ্চাশটা টাকা রাখো, খুশি মনে দিচ্ছি তোমার ছেলেমেয়েদের খাবার কেনার জন্যে।'

'লোকটার কঠোর, ক্ষুধার্ত দৃষ্টিটা বদলে গেল; সেই জায়গায় এলো অসীম কৃতজ্ঞতা। হাসিমুখে বাড়িয়ে ধরা নোটটা নিল সে, চোখ সরিয়ে নিল গরীব ছেলেমেয়েদের জন্যে দয়ালু মানুষের দানের টাকা থেকে। শহর পর্যন্ত শ্বশুর সাহেবের সঙ্গে গেল লোকটা, খুব সম্ভব তাকে আর কোন ছিনতাইকারীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্যেই, তারপর ওখানেই ওকে রিক্সা থেকে নামিয়ে দেয়ার অনুরোধ করল। ওকে নামিয়ে দিয়ে নিজেও রিক্সা থেকে নেমে ওর সঙ্গে হাত মেলালেন আমার শ্বশুর সাহেব। আবার যখন রিক্সায় উঠছেন তখন ওঁর হাত চেপে ধরল কর্কশ চেহারার লোকটা। বললঃ আপনে আজ আমারে বাচাইলেন, স্যার। ছিনতাই করুম মনে করছিলাম, কিন্তু আপনের সাদা দিল দেইখা পারলাম না। গরীব পোলাপানগো ট্যাকা ছিনতাই করলে ঠেকা থাকতাম আল্লার কাছে, আমার বালবাচ্চার উপরে গজব আইত। আল্লায় আপনের বালা করুক।'

'ওই লোকটার সাথে আর দেখা হয়নি নানার?' জানতে চাইল করুণাময়ী মণি।

'না। তবে আমার ধারণা কাজ পেয়ে গেছিল লোকটা, ছেড়ে দিয়েছিল ডাকাতি।'

'ওরে ছাইরা দেওনটা কিমুন অইল,' বলে উঠল সালাম। 'আমি

অইলে পিটাইয়া মাটিতে হোতাইয়া ফালাইতাম।'

'শারীরিক জোরের চেয়ে মায়া-মমতা স্নেহ-ভালবাসা জোর অনেক বেশি, সালাম,' উঠে দাঁড়িয়ে বললেন রহমান খালু। 'ব্যবহার করে দেখো, অনেক ভাল ফল পাবে।'

বলেই দৌড় দিলেন তিনি। আরেকটা গল্পের জন্যে আবদার ধরার আগেই ছুটে গিয়ে ঢুকলেন নিজের রীডিং রূমে, অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করেন তিনি ওখানে।

আবার জাল বিছিয়ে অপেক্ষার পালা। প্রায় বিশমিনিট পর বাইরে ভারী জুতোর আওয়াজ পাওয়া গেল, একবোঝা কাঠ কাঁধে নিয়ে হলরূমে ঢুকল বিশাল বুট পরা বিকট চেহারার রুস্তম আলী। সবাই ঘিরে ধরল ওকে। হট্টগোল দেখে একটু ঘাবড়ে গেল সরল মানুষটা, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে হাসিমুখে তাকাচ্ছে এর-ওর মুখের দিকে, বুঝতে চেষ্টা করছে কি ব্যাপার। বুঝিয়ে দিল খলিল ভাই।

'কিচ্ছা?' সবকটা দাঁত বেরিয়ে গেছে রুস্তম আলীর। 'মুরুখ্যু মানুষ, আমি জানি নি কিচ্ছা?' কাঠের বোঝা নামিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল। আমনি চারপাশ থেকে ছেলেরা সব ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। জোর করে বসাল একটা চেয়ারে, ছাড়াছাড়ি নেই, বলতেই হবে একটা গল্প। যে-কোনও গল্প হলেই হবে।

ছেলেমেয়েরা ওর কাছে গল্পের আবদার করায় নিজেকে খুব সম্মানিত বোধ করল রুস্তম আলী, দাড়িতে আঙুল চালাল, কিন্তু ভেবে পাচ্ছে না কি দিয়ে সন্তুষ্ট করবে এদের। শেষে বলল, 'একটাই কিচ্ছা জানি আমি, যুদ্ধের।'

'বলো, বলো!' চেঁচিয়ে উঠল সবাই। 'কোন যুদ্ধ?'

'মুক্তিযুদ্ধ।' কাঁচাপাকা দাড়িতে আবার আঙুল চালাল রুস্তম আলী। 'খান সেনারা আসে হুইনা পলাইলাম আমরা গেরাম ছাইরা, হেয়ার পর বডার পারোইয়া গেলামগা দ্যাশ ছাইরা। মা আর ভইনরে উদ্বাস্তু ক্যাম্পে থুইয়া গিয়া খারোইলাম মোশারফ সাবের সামনে। যুদ্ধ করুম। ম্যাজোর সাবে কয়, তুমি কি যুদ্ধ করবা, রাইফেল চালাইতে জানো? কইলাম, হিগায়া দিলেই পারুম, চালাই নাই কুনোদিন। আর লগের কুত্তাটা? কইলাম, সার, ছোডবেলা থেইকা মানুষ করছি, এইডা দ অহন পাছ ছাড়ে না। আপনেগো কুনো ডিসটাব অইবো না।'

'লোকের অভাব...নিয়া নিল আমারে। দুই মাস, ঠেনিং দিয়া ফাডাইল বডারে। কয়েকটা হামলায় গিয়া আস্তে আস্তে জানের ডর কইমা গেল কিছুডা। আমি যাই, আমার লগে কাজলও যায়; সরাইলের কুত্তা, দেখতে বালা না, কিন্তুক এতদিনেও অর মতন আর একটা চোহে পড়ে নাই।'

'যেইবার ম্যাজোর সাবে গুলি খাইল কপালে, হেইবার আমিও

আছিলাম কোম্পানীতে। আমি গুলি খাইছিলাম ড্যানায়। বেশি আউগায়া গিয়া ভুল অইছিল। জখম অল্পই, কিন্তুক নিজের রক্ত দেইখা বেহুশ হইয়া পরলাম। মাথার উফরদা সমানে গুলি চলতাছে, আমি খোলা মাঠে পইরা আছি। পিছন থেইকা হগলে ডাক পারে, বাঙ্কারে নামবার কয়, কিন্তুক সাইয্য কি করব গুলির ঠেলায় আউগাইতেই পারে না কেউ।'

'হুশ ফিরতে দেখি আমি ফিল্ডের হাসপাতাল ক্যাম্পে। মাথার কাছে পাহারায় রইছে কাজল,' গলাটা একটু কেঁপে গেল রুস্তম আলীর। সামলে নিয়ে বলল, 'পাতিলের মতন কালা আছিল কুত্তাটা। হুনলাম, আমারে কেমনে বাচাইব, কেউ যখন কুনো দিশা পায় না, ও-ই দৌরায়া গিয়া কাপড় কামরাইয়া দইরা টাইনা নিয়া আমারে ফালাইছিল বাংকারে।'

'দারুণ তো!' দিলুর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো অকুণ্ঠ প্রশংসা। 'বড় হলে আমিও একটা কুকুর পুষব। তারপর?'

স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে রুস্তম আলী।

'ক্যাম্পে খুবই নাম হইয়া গেল কাজলের, হগলতেই আদর করে। দূর-দূর থেইকা দেখতে আসে মাইনষে।'

'খবর আইল, আদামাইল দূরে অগো বাংকারে বহুত অস্ত্র আর গোলাবারুদের চালান আইব রাইতে। বৈকালে তিনজনরে তিনদিক দিয়া গিয়া রেকি কইরা আইতে হইব, কথা সইত্য অইলে আইজ রাইতেই হামলা করুম আমরা। আমি গেলাম পশ্চিম দিক দিয়া পাহার আর জঙ্গল

ডিঙ্গাইয়া কোম্পানীগঞ্জ থেইকা যে পাকা রাস্তা ওই বাঙ্কারে গেছে হেইটার ধারে বইসা নজর রাখতে। হ, চাইর মাইল দূরের পথ। তিন মাইল গিয়া পাহার গুইরাই আৎখা সামনে পইরা গেলাম খান সেনাগো। পাচজন আছিল মোট। আমারে দেইখাই গুলি করল একজন। মনে অইল হাতুরি মাইরা কেউ বাইঙ্গা দিল আমার ফাওডা।' উরুর একটা জায়গা আঙুল দিয়ে দেখাল ও, 'ঠিক এইহান দা ঢুকছিল গুলিটা। পাক খাইয়া পড়লাম মাটিতে, কই আমি আর কই আমার রাইফেল কুনো হুশ নাই।'

'হায়, হায়!' চেঁচিয়ে উঠল সালাউদ্দীন। 'তারপর?'

'হুশ আইলো কাজলের হুঙ্কারে। তিন লাফে অগো উপরে গিয়া পড়ছে কাজল, ফাল দিয়া উইঠা একটার গলা কামরাইয়া ধরছে। পাশ থেইকা, কি কমু, আমার চক্ষের সামনে একজন বেয়োনেট চাশ করল কাজলের পেটে, টান দিয়া ফাইরা ফালাইল পেটটা। এইটা দেইখাই পুরা হুশ আইসা গেল আমার, রাইফেলটা তুইলা নিয়া পয়লা মারলাম বেয়োনেটঅলাটারে, তারপর তার পাশের দুইটারে। গুলি খাইয়া পরতে দেইখা অরা মনে করছিল মইরাই গেছি আমি। কাজল যেইটারে দরছিল, হেইটারে হোতায়া ফালাইছে মাটিতে, আঘাত খাইয়াও ছাড়ে নাই গলা। পাচ নম্বর লোকটা হিম্মত হারায়া ফালাইল, আচমকা ঘুইরা দিল দৌড়। আইকা-বাইকা দৌড়ায়, যানি গুলি না লাগাইতে পারি। তিন গুলিতে মাথার খুলি উরাইয়া দিলাম। তারপর ছেচরাইতে ছেচরাইতে আউগাইলাম আমরা দুইজন দুইজনের দিকে।'

দুই সেকেন্ড বিরতি দিল রুস্তম আলী। যেন সামলাবার চেষ্টা করছে নিজেকে। 'কাছে আইসা পরথমেই আমার গাল চাইটা সান্ত্বনা দেওনের চেষ্টা করল কাজল, এদিকে নিজে ছটফট করতাছে কষ্টে। বুজলাম, সময় আর বেশি নাই, কিন্তুক কিছু করনেরও নাই একটু বাদেই ব্যথায় কাতরাইতে শুরু করল। কেন্টিন থেইকা পানি খাওয়াইলাম, গিলতে পারল না। শ্যাষে...'

হঠাৎ দুইহাতে মুখ ঢাকল রুস্তম আলী। ঠিক প্রয়োজনের সময় ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াল মণি।

পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে মায়াবতী, ওদিকে নিজের চোখে টলটল করছে পানি।

'হ, গুলি করলাম। আধাগন্টা পর অর কষ্ট আর সইয্য করতে না পাইরা গুলি করলাম অর বুকে। ঠিক যানি চোখ বুইজা গুমায়া পড়ল। কষ্ট দূর হইল। ইয়ার পর দুইহাতে কাজলের লাশটা জরাইয়া দইরা হাউমাউ কইরা কানলাম পোলাপানের লাহান।' শার্টের আস্তীনে চোখ মুছে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ও দেয়ালের দিকে।

সবাই চুপ করে আছে। সবারই বুকের ভিতরটা চিনচিন করছে অচেনা এক প্রভুভক্ত কুকুরের জন্য। কিছুক্ষণ কেউ কথা বলল না।

'কাজল যার গলা কামড়ে ধরেছিল তার কি হলো?' জানতে চাইল দিলু।

‘শ্যাষ। পাহারের ধারে পইরা আছি, চান্দ উঠল বড় একখান; মাঝরাইতে আমাগো লোকজন যহন আমারে খুঁইজা পাইল, তহন আমিও পিরায় শ্যাষ। বহুত রক্ত গেছে । হাসপাতালে সাইরা যখন উঠলাম তহন এই ফোটুটা দিল আমারে একজন।’

বুকপকেট থেকে একটা নোটবই বের করল রুস্তম আলী। ওটার ভাঁজে রাখা একটা বি-টু সাইজের সাদাকালো ছবি বের করে দিল ছেলেদের হাতে। স্বাস্থ্যবান একটা কুচকুচে কালো বড়সড় কুকুর, জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে, পাশে চৌকিতে বসা রুস্তম আলী।

‘দারুণ কুকুর! চমৎকার গল্প,’ বলল, সবাই। একটা ঠোঙায় ঝালমুড়ি ভরে ওর হাতে ধরিয়ে দিল মণি। খুশি মনে পা টেনে টেনে চলে গেল রুস্তম আলী। গল্পটা নিয়ে আলাপ করতে করতে অপেক্ষায় থাকল ওরা: এবার কে আসে। কিন্তু কেউ এলো না আর।

মুড়ি শেষ করে ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে পড়ল খেজুর গাছ থেকে হাঁড়ি নামিয়ে রস খাবে বলে। রস খেয়ে ফিরে এলো আধঘণ্টার মধ্যেই, তারপর চলে গেল যে যার ঘরে ঘুমাতে। মন খারাপ, কালই ছুটি হয়ে যাচ্ছে, অনেকদিন দেখা হবে না বন্ধুদের সাথে।

পরদিন আধঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে গেল প্রগ্রেস রিপোর্ট দেয়া। তারপরই ছুটি হয়ে গেল স্কুল। মনে হলো যেন শূন্য হয়ে গেল বুকের

ভিতরটা। মুশকিল হলো সময় কাটানো। সারাদিন মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়াল ওরা মাঠে-ময়দানে-জঙ্গলে।

সন্ধ্যায় সবাই গল্প করছে হলরূমে বসে, এমন সময় বড় একটা ব্যাগ নিয়ে ঘরে ঢুকলেন ডক্টর রহমান। ব্যাগটা খলিলের হাতে ধরিয়ে দিলেন তিনি, কোনও প্রশ্ন না করে ওটা নিয়ে জুলিখালার ঘরে চলে গেল ও। বড় ছেলেদের মধ্যে চোখে-চোখে কথা হলো, টের পেল না সালাম, সুমনের সঙ্গে খেলছিল, খেলতেই থাকল। তুহীন আর দিলুর মধ্যে চোখ টেপাটিপিও ওর নজরে পড়ল না।

হাতমুখ ধুয়ে এসে বসলেন খালু একটা চেয়ারে। একটু পরেই জুলিখালার পিছন-পিছন দুটো ট্রে হাতে ঘরে ঢুকল আসিয়া আর ফাতেমা আপা। ট্রের ওপর তিনটে বড় থালায় সাজানো রয়েছে সিঙাড়া, রসগোল্লা আর সন্দেশের পাহাড়, একপাশে কয়েকটা তস্তরি আর চামচ। ছেলেদের চোখ ছানাবড়া। এগুলো আবার কেন, এরকম তো কথা ছিল না!

‘প্রথমে একটু মিষ্টিমুখ, তারপর ছোট্ট একটা অনুষ্ঠান আছে আজ,’ বললেন জুলিখালা।

‘কিয়ের অনুষ্ঠান, খালা?’ জানতে চাইল সালাম।

‘আগে খেয়ে নাও, তারপর দেখতেই পাবে,’ বললেন তিনি। উঠে দাঁড়িয়েছেন রহমান খালু, তস্তরি আর চামচ ধরিয়ে দিচ্ছেন সবার হাতে। সবাই অবাক, সবাই খুশি।

‘কটা করে নেব, খালু?’ জানতে চাইল অনীক।

‘সবাই একটা করে সিঙাড়া, সন্দেশ আর রসগোল্লা।’

মিষ্টিমুখ হয়ে যেতেই যে-যার তস্তরি রেখে এলো খাবার ঘরে। এবার বড়সড় তিনটে প্যাকেট এনে রাখা হলো টেবিলের ওপর। দিলু গিয়ে দাঁড়াল পাশে। ছোটখাট একটা বক্তৃতা তৈরি করে রেখেছিল দিলু, সুন্দর ভঙ্গিতে মুখস্থ বলে গেল সেটা।

‘এই যে কটা টাকা নিয়ে একটা বিশ্রী পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো কদিন আগে, আমরা সবাই নানান সন্দেহে ভুগলাম, কারও-কারও সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলাম, মিথ্যা দোষ দিলাম একে-ওকে, সেজন্যে আমরা, ছেলেরা, সবাই অনুতপ্ত। সত্যিই যে অনুতপ্ত তার প্রমাণ হিসেবে আমরা আমাদের প্রিয় বিজ্ঞানী আবদুস সালামকে দুটো জিনিস উপহার দিতে চাই। প্রথমটা আমাদের সবার তরফ থেকে, আর দ্বিতীয়টা শিল্পী তুহীন শেখের তরফ থেকে।’

হাঁ হয়ে গেছে সালামের মুখ, যেন বুঝতে পারছে না কি ঘটছে। কাঞ্চন আর অনীক দুটো প্যাকেট নিয়ে পৌঁছে দিল ওর কাছে। খুশি হয়ে হাততালি দিল সুমন, ‘আমাল থালামবাইকে থবাই ভালবাতে!’

ঘরের সবাই জোর হাততালি দিয়ে সমর্থন করল তাকে। বন্ধুগর্বে মনে হচ্ছে ছয় ইঞ্চি ফুলে গেছে তুহীনের বুক, মুখে হাসি আর ধরে না। এবার বক্তৃতা শেষ করল দিলু এই বলে:

‘আর একটি কথা। যে ধৈর্যশীল, সুন্দর মনের ছেলেটিকে আমরা এত কষ্ট দিয়েছি, না চাইতেই যে আমাদের অন্যায় আচরণ মাফ করে দিয়েছে, সেই মহৎহৃদয়, উদীয়মান শিল্পী তুহীন শেখের কাছেও আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। আমরা দুঃখিত, তার প্রমাণস্বরূপ এই সামান্য উপহার।’

শেষ প্যাকেটটা হাতে নিয়ে কাঞ্চনকে ওর দিকে এগোতে দেখে একেবারে হতবাক হয়ে উঠে দাঁড়াল তুহীন। ‘আ-আরে! এ-এরকম তো কোনও ক-কথা ছিল না!’

‘ছিল, ছিল, তোমাকে জানানো হয়নি!’ চোখ নাচিয়ে বলল মণি। ‘দেখলে, কি রকম ঠকালাম আমরা তোমাকে?’ বলে হাততালি দিয়ে উঠল। হাততালিতে যোগ দিল ঘরের সবাই।

‘এবার দেখা যাক তোমরা কে কি পেলে,’ বললেন রহমান খালু। ‘কিন্তু তার আগে আর একটি কথা। ওই অনভিপ্রেত পরিস্থিতির স্রষ্টা গাজী ফরিদের তরফ থেকেই আজকের এই মিষ্টির আয়োজন। মুহূর্তের ভুলে ও যা করে ফেলেছে, সেজন্যে ও আন্তরিক দুঃখিত, এবং ইসকুল বাড়ির সবার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। এসো আমরাও ওকে জানিয়ে দিই আমাদের অন্তরের কথা: আমরা তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।’

সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, ‘ক্ষমা করে দিলাম।’

মাথা নিচু করে বসে ছিল গাজী ফরিদ, মুখ তুলতেই সবাই দেখতে পেল ওর চোখে পানি।

মাইক্রোস্কোপ আর প্রজাপতি ধরার নেট পেয়ে মহা খুশি হয়ে সবার সঙ্গে হাত মেলাল সালাম। আর ঝকঝকে নতুন একটা চমৎকার বেহালা পেয়ে জবান বন্ধ হয়ে গেল তুহীনের।

জুলিখালা প্রস্তাব দিলেন, বেহালাটা বাজিয়ে তুহীন বলুক না ওটা ওর পছন্দ হয়েছে কি না। খালু বললেন, 'হ্যাঁ, এমন একটা গানের সুর বাজাও যার সঙ্গে সবাই আমরা গলা মেলাতে পারি।'

বেহালায় সুর বাঁধতে গিয়েই হাসি ফুটল তুহীনের মুখে। চমৎকার যন্ত্রটা। বোঝাই যায় অনেক দামী। তারে ছড়টা ছোঁয়ালেই গুমরে উঠছে সুর। শুরু হলো গান:

"এক সাগর রক্তের বিনিময়ে

বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা,

আমরা তোমাদের ভুলব না

আমরা তোমাদের ভুলব না।।"

---:শেষ:---